29

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সিয়াম

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আবু তাহের মিসবাহ্
অনূদিত

(29) روزہ کی اہمیت وفضیلت (ارکان اربعہ)
از سید ابوالحسن علی ندویؒ
مترجم: مولانا ابوطاہر مصباحی
ناشر: محمد برادرس 38، بنگلہ بازار، ڈھاکہ 1100.

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সিয়াম ঃ গুরুত্ব ও তাৎপর্য
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদক ঃ মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ্

প্রকাশ কাল
এপ্রিল, ২০১০ খ্রী.
বৈশাখ, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
রবিউস সানী, ১৪৩১ হিজরী

প্রকাশনায়
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
সেল ঃ ০১৭১৭-৪৭৮৭৬৮; ০১৭১১-২৬৬২২৮

প্রচ্ছদ ঃ বশির মেসবাহ্, সালসাবীল

মুদ্রণে ও বাঁধাই
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

ISBN: 984-8290-00-4

মূল্য ঃ ৮০.০০ (আশি) টাকা মাত্র।

SIAM: GUROTAYA O TATPORZA : Written by Sayed Abul Hasan Ali Nadvi, translated by Abu Taher Misbah, published by Muhammad Abdur Rouf, Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100; Printed by M/S Tawakkul Press, 66/1, Naya Paltan, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 831 2105

Price : 80.00, Taka Only

উৎসর্গ

আমার আম্মা-আব্বার পবিত্র হাতে যারা আমাকে স্নেহে-শাসনে মানুষ করার চেষ্টা করেছেন।

ও

উস্তাদতুল্য পরম শ্রদ্ধেয় মাওলানা মুহাম্মদ হারুন ইসলামাবাদী (র.)-এর খিদমতে যিনি আমার চলার পথে অনুপ্রেরণার মশাল ধরেছিলেন।

— অনুবাদক

আমাদের কথা

বস্তুবাদ ও ভোগবাদের চরম পাশবিকতার বেড়াজালে বন্দী মুমূর্ষ মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যুগে যুগে রাসূলগণ আল্লাহ্র নির্দেশিত পথে নিরলস মেহনত করে গেছেন। মানব জাতিকে তাঁরা ধর্মীয় অনাচার, নৈতিক অবক্ষয়, প্রবৃত্তির গোলামী ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে উদ্ধার করেছেন। মানুষের দেহ, আত্মা, হৃদয় ও মস্তিষ্ককে পূত-পবিত্র করেছেন সকল আবিলতা ও পঙ্কিলতা থেকে। সেই সাথে তাঁরা মানুষকে নতুন ভাবে প্রস্তুত করেছেন তার জীবনোদেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। উন্নত নৈতিকতা ও মহত্তম চরিত্রের মাধ্যমে তারা মানুষকে করেছেন জাগ্রত, জীবন্ত এবং যে মহান দায়িত্ব দিয়ে তাকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, সে মহা দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তাঁরা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। নবী-রাসূলগণের চিন্তাই ছিল কিভাবে মানব সমাজকে আখলাকে ইলাহী তথা আল্লাহ্র গুণে গুনান্বিত করে তোলা চাই। যেহেতু মানুষ এই বিশ্ব জাহানের আল্লাহ্ পাকের মনোনিত। খলিফা ও প্রতিনিধি, তার দায়িত্ব অনেক; পুরষ্কার আরো বিশাল। এ মহা দায়িত্বের পূর্ণরূপে আঞ্জাম দিতে হলে একদিকে তাকে হতে হবে সেই মহানস্বত্তার যাবতীয় গুনাবলীর আদর্শ প্রতিবিম্ব। যে মহান সত্ত্বার খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দূলর্ভ সন্মান সে লাভ করতে যাচ্ছে, অপর দিকে পৃথিবীর সৃষ্টিকূলের মাঝেও তার পরিচয় হতে হবে খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। স্বভাব ও ফিতরাতের ক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে থাকবে একটা নিকট সম্পর্ক। কেননা পৃথিবীতেই সে আঞ্জাম দিবে খিলাফতের দায়িত্ব। সেই সাথে তাকে নিতে হবে সৃষ্টিকূলের রক্ষণাবেক্ষণ ও হিফাযতের গুরু দায়িত্ব। আর এ গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন মেধা, প্রজ্ঞা, ধৈর্য্যে, ত্যাগ ও কুরবাণীর– আর এগুলো অর্জনের জন্য সিয়ামই উত্তম মাধ্যম।

সিয়াম নামক পুস্তকটি লেখকের 'আরকানে আরবা'আ' নামক গ্রন্থের খণ্ডাংশ। পাঠকের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের এ আয়োজন। এটা যুগ-ধর্মের প্রেক্ষাপটে যুক্তি-তর্ক ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষনে আলোচনা সমৃদ্ধ একটি অনবদ্য গ্রন্থ। পৃথিবীতে প্রচলিত ধর্ম সমূহের উপাসনার সাথে ইসলামী ইবাদতের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার ইসলামী অনুশাসনের প্রয়োজনীয়তার স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। সিয়াম যে শুধু উপবাসের নাম নয়, বরং বস্তুবাদ ও ভোগবাদের চরম পাশবিকতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার নামই হচ্ছে সিয়াম। গ্রন্থকার তাঁর আলোচনার মাধ্যমে এ কথারই প্রমাণ করেছেন কুরআন হাদীসের আরোকে।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিদগ্ধ মণীষী আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)-র লেখা পুস্তকটির অনুবাদের দায়িত্ব পালন করেছেন এদেশের ইসলামী সাহিত্য জগতের সুনামধন্য ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা আবূ তাহের মেছবাহ। আল্লাহ্ তা'য়ালা লেখককে জান্নাতে উচ্চ মর্যদা দান করুন এবং এর অনুবাদককে সুস্বাস্থ্য ও কলমকে আরো মুযবত করে দেন।

মুহাম্মদ ব্রাদার্সের এ প্রয়াসকে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন কবুল করুন। আমীন।

— প্রকাশক

লেখকের বক্তব্য

সকল প্রশংসা ও স্তুতি আল্লাহ্ পাকের। দরূদ ও সালাম তাঁর প্রিয় হাবীবের ওপর এবং তাঁর বিশিষ্ট বান্দাদের ওপর।

এ বইটিতে ইসলামের একটি বুনিয়াদী রুকন তথা সিয়ামের হাকীকত ও তাৎপর্য এবং ইসলামী শরীয়তে সেগুলোর সঠিক স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। সেই সাথে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এই বুনিয়াদী ইবাদদতের মূল উদ্দেশ্য লক্ষ্য, কল্যাণ, উপকারিতা, ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের ওপর এর সুগভীর প্রভাব সম্পর্কেও পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে। ইবাদতের সেই ব্যাখ্যাই এখানে পেশ করা হয়েছে যা 'খায়রুল কুরূন' তথা ইসলামের 'কল্যাণ শতাব্দী-ত্রয়ের' দ্বীনী প্রজ্ঞার অধিকারী ও হাকীকতসচেতন মুসলমানগণ বুঝেছিলেন এবং যে ব্যাখ্যা ইসলামী ইতিহাসের বিশিষ্টতম ও আস্থাভাজন উলামায়ে দীনের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল ; ইসলামকে তাঁরা অনারবীয় কল্পনা বিলাসিতা ও দার্শনিক জটিলতা এড়িয়ে এবং চরমপন্থী মনোভাব ও অতিশয়োক্তি প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দিয়ে মূল উৎস থেকে নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে গ্রহণ করেছিলেন। বস্তুত দীনকে উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে বাইরের আমদানি করা ধ্যান-ধারণা কিংবা সমসাময়িক কোন মতবাদ দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রভাবিত ছিলেন না এ পুণ্যাত্মাগণ। তদ্রূপ বুনিয়াদী রুকনগুলোর হাকীকত ও তাৎপর্য, উদ্দেশ্য ও তত্ত্ব এবং পদ্ধতি ও মূলনীতিসমূহকে নিজ নিজ সময়ের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দর্শনের মানদণ্ডে বিচার করার মত হীনমন্যতাও তাঁরা প্রদর্শন করেন নি।

বইটি রচনাকালে লেখক কুরআন ও সুন্নাহ্ নতুন করে আগাগোড়া অধ্যয়ন করেছেন এবং এ বুনিয়াদী রুকনের ওপর এ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হয়েছে সেগুলোও পর্যালোচনা করে দেখেছেন। এ ব্যাপারে লেখক সবচেয়ে বেশী উপকৃত হয়েছেন আইম্মায়ে ইসলামের (ইসলামী উম্মাহ্‌র সর্বজনবরেণ্য উলামায়ে দীন) গবেষণালব্ধ লেখনী দ্বারা যাঁদেরকে আল্লাহ্ ইসলামের যথার্থ তত্ত্ব উপলব্ধির দুর্লভ নিয়ামত দান করেছিলেন। দীনের সমঝ যাঁদের ছিল সগভীর ও প্রান্তিকতা-শূন্য। ইসলামী শরীয়তের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও আহকামে ইলাহীর নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য বর্ণনার ক্ষেত্রে যাঁরা অনুসরণ করেছেন শরীয়ত নির্দেশিত পথ ও সাহাবা কিরামের পছন্দনীয় পন্থা (যাঁরা ছিলেন আল-কুরআনের প্রত্যক্ষ সম্বোধিত এবং যাঁদের ভাষায় নাযিল হয়েছে আল-কুরআন।)

দীনের ব্যাপারে এই সকল পুণ্যাত্মার ছিল সহীহ্ সমঝ ও অন্তর্দৃষ্টি, ছিল ইল্ম ও আমলের সমন্বয়। আর ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে, অনুকূল-প্রতিকূল সমন্বয়। আর ছিল জীবনের সকল ক্ষেত্রে, অনুকূল-প্রতিকূল সর্বাবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও মুজাহাদা। তাঁদের ইখলাস ও আত্মবিলোপ ছিল উম্মতের জন্যে অনুকরণীয়। ফলে হিদায়াত লাভের সকল পথই আল্লাহ্ তাঁদের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। জটিল থেকে জটিলতর বিষয় তাঁদের জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। কেননা "যারা আমার পথে মুজাহাদা করে আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার (নিকট পৌছার) পথসমূহ প্রদর্শন করব ; নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ খাঁটি লোকদের সাথেই রয়েছেন।"

[সূরা আনকাবূত ঃ ৬৯]

একদিকে এ সকল ইবাদতের রূহ্ ও হাকীকত তাঁদের দেহ আত্মার শিরা-উপশিরায় প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং সেই রঙে তাঁরা রঞ্জিত হয়ে উঠেছিলেন। অন্য দিকে এমন ইল্ম ও প্রজ্ঞাও তাঁরা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন পূর্ণমাত্রায়, যার সহায়তা ছাড়া শরীয়তের নিগূঢ় তত্ত্ব উদ্ধার করা সম্ভব নয় কারো পক্ষে। একদিকে তাঁরা বিশুদ্ধ নিয়ত, পূর্ণ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা নিয়ে এ সকল ইবাদত পালন করেছিলেন। অন্যদিকে স্বচ্ছ-সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, গভীর জ্ঞান ও বিরল পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে সেগুলোর রূহ্ ও হাকীকতও তাঁরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলে প্রতিটি ইবাদতের হাকীকত ও তাৎপর্য, নিগূঢ় তত্ত্ব ও সুপ্তজ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁদের পাক যবানে ও বরকতময় কলমে।

লেখক এ ব্যাপারে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহ্লভী (র.) বিরচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থটি দ্বারা বেশী উপকৃত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অতুলনীয় এই গ্রন্থে শাহ সাহেব চারটি বুনিয়াদী রুকন সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন তার সারনির্যাস এখানে এসে গেছে।

কুরআন ও সুন্নাহ-ই এই বইটির মূল ভিত্তি। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কুরআন ও সুন্নায় যা কিছু বর্ণিত হয়েছে প্রথমে তা গভীর একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করা হয়েছে। অতঃপর পূর্ববর্তী উলামায়ে দীনের তাফসীর, টীকা ও ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। অতঃপর আল্লাহ পাক স্বীয় রহমত ও করুণাগুণে অধমের সামনে যে সকল অপ্রকাশিত দিক উদ্ভাসিত করেছেন, নিজের অগভীর জ্ঞান ও অপরিপক্কতা সত্ত্বেও সেগুলো উপস্থাপিত করার ক্ষেত্রে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিনি। তদ্রূপ প্রয়োজনবোধে আধুনিক ও সমসাময়িক লেখকদের গ্রন্থ থেকেও নিঃসংকোচে বিভিন্ন উদ্ধৃতি পেশ করা হয়েছে। তবে তথ্য উপস্থাপন, ভাষাশৈলী ও বর্ণনা পদ্ধতির দিক থেকে বইটি যাতে যুগোপযোগী ও মানোত্তীর্ণ হয় এবং কোথাও সামান্যতম রসহীনতা অনুভূত না হয় আগাগোড়া সে চেষ্টা করা হয়েছে। লেখক কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করেছেন, শুধু আল্লাহ্র

সীমাহীন করুণার বদৌলতে বইটি প্রাচীন ও আধুনিক উভয় গুণাগুণের অধিকারী হয়েছে। বইটি এখন সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ওপর রচিত গোটা ইসলামী সাহিত্য ভাণ্ডারের প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম।

লেখক তার বইটিতে নতুন বংশধরদের সামনে পূর্ববর্তীদের গ্রন্থসমূহে গচ্ছিত মহামূল্যবান আমানত আধুনিক রুচিসম্মতভাবে পেশ করার চেষ্টা করেছেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, পূর্বপুরুষদের বর্ণনাভঙ্গি ও উপস্থাপন পদ্ধতির সাথে অপরিচয়ের ফলে বর্তমান বংশধরগণ তাদের ইল্‌ম ও হিকমত এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার নির্মল উৎসধারা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, পূর্ববর্তীদের সাথে সম্পর্ক দিন দিন শিথিল হয়ে পড়ছে এবং আজিমুশ্‌ শান ইসলামী কুতুবখানা থেকে স্বচ্ছ জ্ঞান আহরণের পথ ধীরে ধীরে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বলাবাহুল্য এটা আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্য চরম বিপর্যয়ের পূর্বাভাস।

ইসলামী উম্মাহ্‌ যেভাবে ইবাদতের শেকেল-আকৃতি এবং আহ্‌কাম ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে সংরক্ষণের মাধ্যমে পূর্ববর্তীদের নিকট পৌঁছিয়েছে তদ্রূপ ইবাদতের রূ ও হাকীকত এবং জীবন ও সমাজের ওপর এগুলোর প্রভাবও মহামূল্যবান উত্তরাধিকা সম্পদরূপে হস্তান্তরিত হয়ে এসেছে। এভাবে ইবাদতের উভয় দিকেই অখ ধারাবাহিকতা রক্ষা করে পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায় আজ আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে তাই এখন এ সকল ইবাদতের উদ্দেশ্য ও হাকীকত সম্পর্কে নতুন করে এমন কোন ব্যাখ্যা উদ্ভাবনের অধিকার কারো নেই যা ইসলামী ইতিহাসের কোন অধ্যায়েই এ উম্মাহ্‌র কাছে পরিচিত ছিল না। তদ্রূপ বাইরে থেকে ধার করা কোন পোশা জবরদস্তি করে এগুলোর গায়ে চাপিয়ে দেয়ার ধৃষ্টতাও বরদাশ্‌ত করা যাবে না।

বইটি রচনাকালে লেখকের মনে হলো, অন্যান্য ধর্মের (ইতিহাসের কোন ন কোন অধ্যায়ে, কোন না কোন উপায়ে যে ধর্মগুলো আসমানী শরীয়তের সাথে সম্পৃ ছিল এবং যেগুলো আজো পৃথিবীর একটা উল্লেখযোগ্য অংশের ধর্মরূপে স্বীকৃতি পে আসছে) ইবাদত ব্যবস্থার ওপরও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা উচিত। এ চিন্তায় উদ্বু হয়েই ইসলামী ইবাদত ব্যবস্থা, তার আহ্‌কাম ও দর্শনের সাথে অন্যান্য ধর্মের ইবাদ ব্যবস্থা, আহ্‌কাম ও দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এমন সব সূ থেকেই অন্যান্য ধর্মের তথ্য ও উপকরণাদি সংগ্রহ করা হয়েছে যেগুলো খোদ সংশ্লি ধর্মের লেখক, চিন্তাবিদ, গবেষক ও বিদগ্ধ জনদের দৃষ্টিতে নির্ভরযোগ্য ও প্রামাণ্য ব স্বীকৃত। তদ্রূপ ইসলামী ইবাদতের ব্যাখ্যা দানকালে প্রথমত কিতাব সুন্নাহ্‌ এব দ্বিতীয়ত সর্বজনমান্য উলামায়ে ইসলামের প্রামাণ্য গ্রন্থরাজির ওপর নির্ভর ক হয়েছে। তুলনামূলক আলোচনাটি যাতে বস্তুনিষ্ঠ, নিরপেক্ষ ও প্রান্তিকতাশূন্য হ সেজন্য যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং অত্যন্ত বিশ্বস্ততা

দিয়ানতদারির সাথে প্রতিটি ধর্মের সেই সারানির্যাসই উপস্থাপিত করা হয়েছে যা উক্ত র্মের আইন রচয়িতা ও শাস্ত্রবিদদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

বস্তুত এটা খুবই জটিল ও ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। কেননা অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থা ও বধি-বিধানগত অবস্থা ইসলামী শরীয়ত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিপরীত দুই মেরুতে ভয়ের অবস্থান। একজন বিদগ্ধ গবেষককে ইসলামী শরীয়তের প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় ম্পর্কে অবগত হতে গিয়েও বিন্দুমাত্র প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতে হয় না। কেননা তিটি ইবাদতের বিভিন্ন দিকের ওপর মওজুদ রয়েছে বিরাট গ্রন্থসম্ভার। পক্ষান্তরে ন্যান্য ধর্মের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করতে গেলে াকে অত্যন্ত অসহায়ভাবে মুখোমুখি হতে হয় সীমাহীন অস্পষ্টতা, দুর্বোধ্যতা, দ্ব্যর্থতার অপূরণীয় একাডেমিক শূন্যতার, তথ্যের নিদারুণ স্বল্পতার। আল্লাহ্ পাকের বিশেষ াহেরবানীতে এ বইটিতে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের ইবাদত ব্যবস্থার এত দূর পর্যাপ্ত লনামূলক আলোচনা এসে গেছে, তা এক্ষেত্রে বিরাজমান শূন্যতার পরিপূরক।

এ তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন এজন্যও ছিল যে, এর ফলে একজন মুসলমান ভীরভাবে এটা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম আমাদের জন্য আল্লাহ্প্রদত্ত ও না পরিশ্রমে লব্ধ কত বড় নিয়ামত এবং এজন্য তাঁর পাক দরবারে আমাদের কী রিমাণ শোকর ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সম্ভবত এটাই আমীরুল মু'মিনীন রত উমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর নিম্নোক্ত বক্তব্যের তাৎপর্য।

তিনি বলেছেন, "খুবই আশংকা আছে, ঐ ব্যক্তি ইসলামের এক একটি করে ইট ল ফেলবে, যে জাহেলিয়াতের যুগ দেখেনি বরং ইসলামী যামানাতেই পৃথিবীতে চোখ লেছে (কেননা এটা সে উপলব্ধিই করতে পারবে না, শিরক্ ও কুফরীর কী ঘোর কার থেকে ঈমান ও তাওহীদের কেমন স্নিগ্ধ আলোর দিকে আল্লাহ্ তাকে নছেন)"। অবশ্য এতে কোন সন্দেহ নেই এটা এক সম্প্রসারণশীল বিষয়বস্তু এবং ্য ও গবেষণার এক সুবিস্তৃত ক্ষেত্র। হয়ত বিভিন্ন ধর্মের বিদগ্ধ গবেষক ও লেখক াবিদদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে। নতুন নতুন গ্রন্থ ও াকোষ প্রণীত হবে। এ বইয়ের লেখকও, যদি জীবন বিশ্বস্ততার পরিচয় দেয়—খোলা া সেগুলো অধ্যয়ন এবং আগামী সংস্করণগুলোতে সংযোজন করার জন্য সাগ্রহে ত রয়েছে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, লেখককে রোগ-শোক, হাজারো কর্মব্যস্ততা ও াত্বভার সত্ত্বেও বইটির রচনাকার্যে হাত দিতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বেশ কিছু দিন থেকে শ্রেণীর লেখক, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মধ্যে একটা দুঃখজনক প্রবণতা লক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ অত্যন্ত নিঃসংকোচে ও বেপরোয়াভাবে আধুনিককালের বিভিন্ন

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দর্শনের সাথে যথাসাধ্য সঙ্গতি বজায় রেখে বস্তুতান্ত্রিক পরিভাষায় ইসলামী ইবাদতগুলোর স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা দানকেই এরা ইসলামের অতি বড় খিদমত বলে ধরে নিয়েছেন। ইসলামী শরীয়তের মৌলিক ইবাদতগুলোর হাকীকত ও তাৎপর্য, কল্যাণ, উপকারিতা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা ও পরিবেশনার ক্ষেত্রে বিরাজমান এ নিদারুণ বিভ্রান্তি ও অরাজকতার প্রেক্ষিতে এ আশঙ্কা আজ খুবই জোরদার হয়ে দেখা দিয়েছে, এই বিশেষ চিন্তাধারায় প্রতিপালিত ও গড়ে ওঠা শ্রেণীটি, আল্লাহ্ না করুন, হয়তো একদিন ইসলামী শরীয়তের মূল রুকনগুলোর আসল হাকীকত ও তাৎপর্য, অন্তর্নিহিত কল্যাণ ও তাৎপর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। যে মহান উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্ত এ রুকনগুলো ফরয করা হয়েছে, সেগুলো একেবারেই বিস্মৃত হয়ে যাবে। বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা ও সংকীর্ণ আধুনিক পরিভাষার বদৌলতে ঈমান ও ইহ্‌তিসাবের ধারণাই আমাদের মন-মগজ থেকে অপসৃত হয়ে যাবে এবং স্থূল ও বস্তুতান্ত্রিক চিন্তাধারা দাসত্ব ও ঐকান্তিকতার আত্মা বা স্পিরিটকেই গ্রাস করে ফেলবে। এটা এ বিশেষ চিন্তাধারার ধারক ও প্রচারকগণ অনুভব করুন বা না-ই করুন ইসলাম উম্মাহ্‌র জন্য সত্য সত্যই এক সর্বনাশা বিপদস্বরূপ! ইসলামী ইবাদতের হাকীকত, মূল উদ্দেশ্য ও প্রকৃত কল্যাণ সম্পর্কে চরম বিভ্রান্তি ও বিকৃতির অতল গহ্‌বরে নিক্ষেপের এ প্রাথমিক প্রস্তুতি মাত্র।

বইটির প্রথম আরবী সংস্করণ প্রকাশিত হয় 'দারুল ফাতাহ্, বৈরুত থেকে ১৩৮৭ হিজরীতে। তিন-চার মাসের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। প্রকাশকের পক্ষ থেকে তাগাদা এলো, অচিরেই দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। লেখক পুনঃদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে চাইলে তা এখনি করা উচিত। প্রথম সংস্করণে বেশ কিছু ভুল রয়ে গিয়েছিল, কিন্তু প্রচণ্ড চাহিদার ফলে প্রকাশিত সংস্করণের ভুলগুলো হুবহু এ সংস্করণেও থেকে গেল। সম্ভবত ইতোমধ্যে তৃতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়ে গেছে।

এক বছরের মধ্যে বইটির তুর্কী অনুবাদ প্রকাশিত হলো তুরস্কের 'কাওনা' থেকে। ইংরেজিতেও বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হলো অল্পকালের মধ্যেই এবং সংশ্লিষ্ট মহলে সমাদরও পেল। ভারতে সুধীমহলে সমাদৃত কয়েকটি পত্রিকা (মা'আরিফ ; বুরহান, সিদকে জদীদ) বইটির এমন উচ্ছ্বসিত সমালোচনা বের করল যা লেখক ও বইয়ের মান ও যোগ্যতার বহু ঊর্ধ্বে।

উর্দু অনুবাদের ভার দেয়া হলো লেখকের ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ আল-হাসানীকে। লেখকের অন্য বইগুলোর মত এ বইটির অনুবাদেও সে অত্যন্ত সুচারুরূপে আঞ্জাম দেয়। পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া দেখে দেয়ার সময় তথ্যের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সংশোধন ও

সংযোজন করে। ফলে অনুবাদটি এখন আরো পূর্ণাঙ্গ ও নির্ভরযোগ্যরূপে উর্দুভাষী পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হচ্ছে। এ বইটি এক সুদীর্ঘ অধ্যয়ন, গবেষণার ফসল ও সারনির্যাস এবং এর মাধ্যমে অন্ততপক্ষে একটি বিশাল গুরুত্বপূর্ণ ও নাযুক বিষয়ের ওপর উদার গবেষণার নব দ্বার উন্মোচিত হবে।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের।

আবুল হাসান আলী নদভী
দায়েরা শাহ্ আলামুল্লাহ্
উত্তর প্রদেশ, রায়বেরেলী, ভারত

সূচিপত্র

সিয়ামের হাকীকত ঃ কল্যাণ ও তাৎপর্য

মানুষ পশু নয়, নয় ফিরিশ্‌তা/২১
দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব/২৩
জীবন, ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে এ দ্বন্দ্বের ফল/২৭
মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়ন ও মহোত্তম নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায়
নবুওয়তের ভূমিকা/৩০
সিয়ামের উদ্দেশ্য ও জীবনের ওপর তার প্রভাব/৩১
অন্যান্য ধর্মের সিয়াম (রোযা)/৩৪
ইহুদী ধর্ম/৩৫
খ্রিষ্ট ধর্ম/৩৬
সিয়ামের প্রকৃতির নির্ধারণে অবাধ স্বাধীনতার কু-ফল/৩৯
খাদ্য সংকোচন না বর্জন?/৪০
ধারাবাহিক ও বিক্ষিপ্ত সিয়াম/৪১
আশুরার সিয়াম/৪২
সিয়ামের বিধানবাহী আয়াত সমূহ/৫০
রমযানের সাথে সিয়ামের সম্পর্ক/৫৫
ইবাদত ও পুণ্যের বিশ্ব মৌসুম/৫৭
মানব সমাজের সিয়ামের প্রভাব/৫৮
ফাযায়েলের গুরুত্ব/৫৮
সিয়ামের হাকীকত ও মর্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা/৬১
মুসলমানদের ক্ষমাহীন উদাসীনতা//৬৬
তাহ্‌রীফ (বিকৃতি) ও সীমালংঘনের কবল থেকে হিফাযত/৬৮
ই'তিকাফ//৭১
সিয়ামে ইসলামের বিপ্লবী সংস্কার/৭৪

সিয়াম

গুরুত্ব ও তাৎপর্য

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ۰

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।"

[সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩]

সিয়াম

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۝

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।" [সূরা আল-বাকারা ঃ ১৮৩]

বিস্‌মিল্লাহির্‌ রাহ্‌মানির্‌ রাহিম

সিয়ামের তাৎপর্য

সিয়ামের ফরয বিধান নাযিল সম্পর্কে আল-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।" [আল্‌-বাকারা ঃ ১৮৩]

মানুষ পশু নয়, নয় ফিরিশ্‌তা

মানুষ হচ্ছে প্রাণীকূল ও ফিরিশতার মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ আল্লাহ্‌ পাকের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এই দুই সৃষ্টির স্বভাব ও ফিতরত এবং চরিত্র ও প্রকৃতির সূক্ষ্ম নিখুঁত ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাবেশ ঘটেছে মানুষের মধ্যে। একদিকে এই ইনসান যেমন পাশবিকতার কঠিন নিগড়ে বন্দী, অন্যদিকে তেমনি সে ফিরিশতাকুলের জ্যোতির্ময় গুণাবলীর সুযোগ্য অধিকারী। বস্তুত যে মহান উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষের সৃষ্টি এবং যে গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য সে নির্বাচিত, এ অপূর্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে সে যোগ্যতাই দান করা হয়েছে তাকে। প্রাণীকুল ও ফিরিশতাকুলের মধ্যে কারোই সে যোগ্যতা ছিল না। সে দায়িত্বেরই নাম হচ্ছে খিলাফত। খিলাফতের এ মহান দায়িত্ব অর্পণের জন্য মানুষের মনোনয়ন লাভের অভূতপূর্ব ঘটনা আল-কুরআনে আল্লাহ্‌ এভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً - قَالُوْا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ .

"যখন আপনার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন ঃ পৃথিবীতে আমি আমার খলীফা পাঠাতে যাচ্ছি, তখন তারা বলল ঃ আপনি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে পাঠাবেন যারা সেখানে ফাসাদ সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে? অথচ আমরাই তো প্রশংসাসহ আপনার তাসবীহ পাঠ করছি এবং আপনার পবিত্রতা কীর্তন করছি। আল্লাহ্ বললেন ঃ নিশ্চয় আমি জানি যা তোমরা জান না।"

[সূরা আল-বাকারা ঃ ৩০]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ ۔ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا ۔

"আমি আসমান যমীন ও পাহাড়-পর্বতের কাছে আমানত পেশ করলাম। কিন্তু সকলেই সন্ত্রস্ত অবস্থায় নিজেদের অক্ষমতা প্রকাশ করল, অথচ মানুষ তা বহন করতে রাযী হলো। নিঃসন্দেহে সে বড় অবিচারী, বড় অবিবেচক।"

[সূরা আল্-আহ্যাব ঃ ৭২]

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ ۔ مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۔

"জিন-ইনসানকে আমি শুধু আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আমি তার কাছে রিয্ক কিংবা আহার চাই না।" [সূরা যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৭]

মানুষ এই বিশ্ব জাহানে আল্লাহ্ পাকের খলীফা ও প্রতিনিধি। তার দায়িত্ব বিরাট; পুরস্কার আরো বিরাট। এ মহাদায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দিতে হলে একদিকে তাকে হতে হবে সেই মহান সত্তার যাবতীয় গুণাবলীর আদর্শ প্রতিবিম্ব, যে মহান সত্তার খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দুর্লভ সম্মান সে লাভ করতে যাচ্ছে। অপরদিকে পৃথিবীর সৃষ্টিকুলের সাথেও তার পরিচয় হতে হবে খুবই ঘনিষ্ঠ ও নিবিড়। স্বভাব ও ফিত্রাতের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে থাকতে হবে একটা নিকট সাদৃশ্য। কেননা পৃথিবীতেই সে আঞ্জাম দেবে খিলাফতের দায়িত্ব। সেই সাথে তাকে নিতে হবে সৃষ্টিকুলের রক্ষাণাবেক্ষণ ও হিফাজতের যিম্মাদারী।

তাই জড় জগতের এই মানুষকে আমরা দেখতে পাই ঊর্ধ্ব জগতের জ্যোতির্ময় গুণাবলীর এক আদর্শ প্রতিবিম্বরূপে। মানুষ তার সুদীর্ঘ ইতিহাসের সকল স্তরেই পুণ্য ও পবিত্রতা, স্নেহ ও মমতা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা এবং ধৈর্য ও সহনশীলতাসহ যাবতীয় নৈতিক গুণাবলী সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট ছিল। এই ঊর্ধ্ব জাগতিক গুণাবলীর মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে তার আত্মার শান্তি ও তৃপ্তি, এমন কি মানবিক গুণাবলী থেকে বঞ্চিত নিকৃষ্টতম ব্যক্তিও ঊর্ধ্ব জাগতিক গুণাবলীর অধিকারী ব্যক্তিদেরকেই হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে সশ্রদ্ধ ভক্তি ও প্রেম নিবেদন করেছে এবং তাদের সামনে নিজেদেরকে মানুষরূপে পরিচয় দিতে সংকোচবোধ করেছে।

অন্যদিক জড় জাগতিক গুণাবলীও সে গ্রহণ করেছে নির্দ্বিধায়। যাবতীয় পাশবিক দুর্বলতা ও ক্ষুদ্রতাকে ঠাঁই দিয়েছে নিজের মধ্যে যেন সৃষ্টিকুলের ব্যথা-বেদনা ও দুঃখ-অনুভূতির সাথে খাপ খাওয়াতে পারে সে নিজেকে। বস্তুত ক্ষুধা, পিপাসা, পানাহারের ইচ্ছা, ভোগ-বিলাসের স্পৃহা, জৈবিক চাহিদা ও প্রকৃতির অফুরন্ত সম্পদ ভাণ্ডার আহরণ ও যথাস্থানে তা ব্যয় করা, আল্লাহ্‌র দেয়া নিয়ামত থেকে উপকার লাভ, নতুনের আরাধনা, অজানাকে জানার অনুসন্ধিৎসা, নগর-শিল্প ও জীবন সভ্যতা গড়ে তোলার সংগ্রামে নিজেকে উৎসর্গ করার পেছনে মানুষের জড় জাগতিক গুণাবলীই ক্রিয়াশীল।

দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব

দেহ ও আত্মা হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি এবং এ দুইয়ের সমষ্টিই হচ্ছে মানুষ। বস্তুত মানব সৃষ্টির প্রথম ক্ষণ থেকেই দেহ ও আত্মার এ দ্বন্দ্ব চলে আসছে বিরামহীনভাবে।

রূহ্ বা আত্মার সম্পর্ক হচ্ছে ঊর্ধ্ব জগতের সাথে। তাই মানুষকে সদা সে ঊর্ধ্ব জগত অভিমুখেই আকর্ষণ করে। স্মরণ করিয়ে দেয় তাকে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও দায়িত্বের কথা। সেই সাথে উদ্বুদ্ধ করে জড় জগতের সকল হীনতা, নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও স্থূলতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে এবং এই সোনার খাঁচার বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসতে।

আত্মার একমাত্র কামনা এই, মানুষ বিচরণ করবে ঊর্ধ্ব জগতের অন্তহীন ব্যাপকতায়। পুলকিত হবে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সকল রহস্য ও সৌন্দর্য অবলোকনের

মাধ্যমে। তাই সে মানুষকে আহবান জানায় পানাহার, ভোগ-বিলাস ও জৈবিক চাহিদার ধরা-বাঁধা নিয়ম-নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে জীবনের অন্তত কয়েকটি মুহূর্ত অতিক্রম করার এবং পানাহারের প্রাচুর্য সত্ত্বেও ক্ষুৎ-পিপাসার অপার্থিব স্বাদ উপভোগ করার যা হাযারো প্রকার সুমিষ্ট পানীয় ও উপাদেয় খাদ্য গলাধঃকরণের মধ্যে অনুভব করা সম্ভব নয়। বছরে একবার হলেও জড় জাগতিক এই নিয়ম-নিগড় ছিন্ন করে মানুষকে তার আত্মার আহ্বানে সাড়া দেয়া উচিত। আত্মার দাবি হলো মানুষ তার সুদীর্ঘ জীবনের এ ক'টি মুহূর্তকেই যার মাধ্যমে সে লাভ করেছে অন্তরের প্রশস্ততা, হৃদয়ের প্রশান্তি, আত্মার পবিত্রতা, উদরকেন্দ্রিক ও পাশবিক জীবনের গোলামি ও বৈচিত্র্যহীন একঘেঁয়েমী থেকে মুক্তির আস্বাদ—সে গণ্য করবে শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম মুহূর্তরূপে এবং এ ক'টি মুহূর্ত আবার ফিরে পেতে সে তেমনি উন্মুখ ও চঞ্চল হবে, দিনান্তের ক্লান্ত পাখী যেমন ব্যাকুল-চঞ্চল হয় নীড়ে ফিরে যেতে কিংবা ডাঙ্গায় তুলে আনা মাছ পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এসবই হচ্ছে রূহ বা আত্মার অবদান, যা আল্লাহ্‌র নির্দেশে আলিমে গায়ব তথা রহস্যময় ঊর্ধ্ব জগত থেকে মানুষের স্থূল দেহ পিঞ্জরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। আল্লাহ্ ইরশাদ করেছেন ঃ

وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّيْ

"তারা তোমাকে রূহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। তুমি বলে দাও, রূহ হচ্ছে আমার রবের 'হুকুম' বিশেষ।" [সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৮৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ -

"আমি তার দেহে নিজের পক্ষ থেকে রূহ্ ফুঁক দিলাম।" [সূরা হিজর ঃ ২৯]

আত্মার বিপক্ষ শক্তি হচ্ছে দেহ। তাই দেহ মানুষকে আপন কেন্দ্র তথা পৃথিবীর দিকে আকর্ষণ করে। জড় জাগতিক স্থূলতায় তাকে চিরআবদ্ধ রাখতে চায়। আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ -

"নিশ্চয় মানুষকে আমি পচা কাদার খনখনে মাটি দ্বারা তৈরি করেছি।"

[সূরা হিজর ঃ ২৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّنْ طِيْنٍ لَّازِبٍ ـ

“তবে তাদের আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন, গঠনের দিক দিয়ে এরাই বেশী মজবুত, না তারা যাদের আমি সৃষ্টি করেছি। আমি তাদেরকে আঠাল মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছি।”

আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

“মানুষকে তিনি এমন মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা খাপড়ার ন্যায় বাজত।” [সূরা রহমান ঃ ১৪]

মানুষের ওপর আত্মার প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা যখন দেহে চলে আসে মানুষ তখন পালছেঁড়া নৌকার মতই ভেসে যায় ভোগ-লালসা, বিলাস-লিপ্সা, অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা ও পাশবিক চাহিদার সর্বকুলনাশা স্রোতের টানে। সকল নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে নেমে যায় সে চরম অধঃপতনের অতল অন্ধকারে। মত্ত হাতির মতই ছুটে চলে সে তার পাশব ইচ্ছার পেছনে। রশি ছেঁড়া পশুর মত তখন তার একই চিন্তা ও একই ভাবনা – লাগামহীন ভোগ, বাধা-বন্ধনহীন উদরপূর্তি। অরণ্যের পশুও তখন ভাবে, মানুষ বুঝি তাদেরই সমগোত্রীয় কোন জীব! বিবেক-বুদ্ধি, আইন, নৈতিক ও সামাজিক বিধি-নিষেধ, কিংবা স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরামর্শ, সতর্কবাণী ও সাধুজনদের নীতিকথা কোন কিছুই তখন সামান্য প্রতিরোধ সৃষ্টি করতে পারে না তার উন্মত্ত পাশবিকতার সামনে। তৃণখণ্ডের মতই ভেসে যায় সব কিছু। তার সমস্ত বুদ্ধিমত্তা, প্রতিভা ও উদ্ভাবনী শক্তি তখন নিয়োজিত হয় ভোগ-বিলাসের নিত্য-নতুন ও চমকপ্রদ পন্থা উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেহের বল্গাহীন চাহিদা পূরণ ও কুৎসিত পাশবিকতা চরিতার্থ করার কাজে। তবু তার অদম্য ভোগস্পৃহা ও উদগ্র লালসার তৃপ্তি নেই! সে তখন আশ্রয় খোঁজে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রের। কি কৌশলে আরো কিছু দিন ধরে রাখা যায় পলায়নোদ্যত এ যৌবনঃ সেবন করে বলবর্ধক, রুচিবর্ধক ও ক্ষুধা উৎপাদক বিভিন্ন টনিক ও হজমী দাওয়াই।

উদ্দেশ্য–অধিক স্ফূর্তি ও উদরপূর্তির মাধ্যমে জীবনকে আরো কিছুদিন আরো অধিক মাত্রায় উপভোগের সুযোগ দান। কেননা সে তখন 'উপভোগ ও স্ফূর্তিই হচ্ছে জীবন' এই দর্শনের পূজারী। ফলে জীবনের সর্বক্ষেত্রে চোখ ধাঁধানো উন্নতি, অগ্রগতি ও বিজ্ঞানের অভাবনীয় জয় যাত্রার ফলে অর্জিত অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্ছলতা সত্ত্বেও মানুষ হালের বলদ কিংবা ঘানির পশুর মত একই বৃত্তের চারপাশে সদা আবর্তিত হতে থাকে। 'ডাইনিং হল ও টয়লেট রুম'–এ দু'য়ের মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে তার দিন-রাতের সকল কর্মতৎপরতা। এ ছাড়া আর কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে না তার জীবনে। ভোগবিলাস, পানাহার ও উদরপূর্তির পাশবিক ইচ্ছা ছাড়া আর সকল মহৎ ইচ্ছার ঘটে অপমৃত্যু। সে তখন উপার্জন করে আরো অধিক মাত্রায় উদরপূর্তির জন্য এবং উদরপূর্তি করে আরো অধিক মাত্রায় উপার্জনের জন্য। আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক এই শ্রেণীর মানুষের কিংবা মানুষরূপী এই শ্রেণীর পশুর এমন সূক্ষ্ম-নিখুঁত চরিত্র তুলে ধরেছেন যা কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ
مَثْوًى لَّهُمْ۔

"যারা অবিশ্বাসী তারা ভোগ-বিলাস ও পানাহারে ডুবে আছে যেমন চতুষ্পদ জন্তু পানাহারে লিপ্ত থাকে। জাহান্নামই তাদের শেষ মঞ্জিল।

[সূরা মুহাম্মদ ঃ ১২]

বস্তুত আত্মার নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও নবুওতের আলোক বঞ্চিত দেহসর্বস্ব মানুষের এই হচ্ছে স্বাভাবিক পরিণতি। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ
الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِيْنَ۔ وَلَوْشِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَلٰكِنَّهٗ اَخْلَدَ
اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ۔ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ
يَلْهَثْ اَوْتَتْرُكْهُ يَلْهَثْ۔ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا۔
فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۔

"আর এদেরকে সেই ব্যক্তির অবস্থা পড়ে শোনান, যাকে আমি আমার নির্দশনসমূহ দান করেছিলাম। কিন্তু সে তা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে গেল। তখন শয়তান তাকে ধাওয়া করল। ফলে সে বিপথগামীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ল। আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে সেই নিদর্শনসমূহের কল্যাণে আমি তাকে উচ্চ মর্যাদায় উন্নীত করতে পারতাম। কিন্তু সে তো যমীনের দিকেই ঝুঁকে পড়ল এবং নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে লাগল।" [সূরা আ'রাফ ঃ ১৭৫-১৭৬]

জীবন, ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে এ দ্বন্দ্বের ফল

পৃথিবীতে মানুষের জীবনযাত্রার প্রথম সূচনা থেকেই শুরু হয়েছে দেহ ও আত্মার এ দ্বন্দ্ব। বস্তুত মানব জাতির বৈচিত্র্যপূর্ণ সভ্যতার এ ভাঙা-গড়া এবং ধর্ম ও নৈতিকতার এ সুদীর্ঘ ইতিহাস দেহ ও আত্মার চিরন্তন দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। যুগে যুগে দেশ ও জাতি উত্থান-পতন, বিভিন্ন সভ্যতার অভ্যুদয় ও বিপর্যয়, ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি আনুগত্য ও বিদ্রোহের পেছনে মূলত এ দ্বন্দ্বই ক্রিয়াশীল। ধর্ম ও সভ্যতার সুবিস্তৃত ইতিহাস একথাই প্রমাণ করে, যখনই মানুষের প্রথম শক্তিটি দ্বিতীয়টিকে অবদমিত করে পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে, তখনই ধর্ম ও নৈতিকতার ইতিহাস এক নতুন দিকে মোড় নিয়েছে। গোড়াপত্তন হয়েছে জীবনবিমুখ বৈরাগ্যবাদের। ফলে মানুষ উপেক্ষাভরে চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য থেকে। প্রত্যাখ্যান করেছে প্রকৃতির অফুরন্ত নিয়ামত যা আল্লাহ্ পাক শুধু মানুষের জন্যই সৃষ্টি করেছিলেন। লোকালয় থেকে পালিয়ে গিয়ে মানুষ আশ্রয় নিয়েছে জনমানবশূন্য গহীন অরণ্যে। রাতের পর রাত জেগে, দিনের পর দিন উপবাস থেকে এবং অন্যান্য উপায়ে দেহের ওপর অত্যাচার করার নামই ছিল ইবাদত। মনে করা হতো, কঠিন বৈরাগ্যব্রতের মাধ্যমেই কেবল মানুষ লাভ করতে পারে নৈতিক ও আত্মিক উৎকর্ষ। মধ্যযুগীয় ইউরোপের খ্রিস্টান সন্ন্যাসীদের চমকপ্রদ ঘটনাবলী ছিল মানুষের বৈরাগ্যবাদী মানসিকতা ও প্রবণতার চরমতম প্রকাশ।[1] আল-কুরআনে আল্লাহ্ পাক অত্যন্ত এ'জাযপূর্ণ ভাষায় তুলে ধরেছেন মানুষের স্বভাব ও ফিতরাতের এই দুর্বল দিকটির নিখুঁত চিত্র।

---

১. বিস্তারিত জানতে হলে পড়ুন W.E.H. LECKY বিরচিত HISTORY OF EUROPEAN MORAIS কিংবা লেখকের انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر (গ্রন্থটির অনুবাদ কিছু দিন আগে 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো' নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।)

ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا۔

"আর তারা নিজেরাই বৈরাগ্য প্রথা আবিষ্কার করেছে। আমি এটা তাদের ওপর ওয়াজিব করি নি। কিন্তু তারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্যই তা অবলম্বন করেছিল। কিন্তু তারা তা যথাযথভাবে পালন করে নি।" [সূরা হাদীদ ঃ ২৭]

এর ফল এই দাঁড়াল, মানুষ দৈহিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক দিয়ে চরম অবক্ষয়ের সম্মুখীন হলো। পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেল, এমন কি মানব সমাজের অস্তিত্বই হুমকি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলো। খিলাফতের যে সুমহান দায়িত্ব পালনের জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল এবং যে কারণে মানুষ সৃষ্টি জগতে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদাপূর্ণ আসন লাভ করেছিল, সেখান থেকে যে নিজেরাই কর্মদোষে বিচ্যুত হলো। জীবন সংগ্রামের কঠিন ও বন্ধুর পথ পরিহার করে ফিরিশতাদেরকেই সে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করল। যে মানুষ একদিন ফিরিশতাদের ঈর্ষার পাত্র ছিল, আদমকে সিজদা করে যারা নিজেদের সৃষ্টি সার্থক করেছিল, সেই ফিরিশতাই হলো খোদ মানুষের ঈর্ষার পাত্র। মানুষের তখন একমাত্র কাম্য, দেহের এই জড় বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ফিরিশতাদের কাতারে শামিল হওয়া, যাদের নেই কোন ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা, নেই কোন চাহিদা ও দাবী।

সভ্যতা ও ধর্মের ইতিহাসে এমন যুগও এসেছে, যখন আত্মাকে পরাস্ত করে মানুষের পাশবিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। অধঃজাগতিক স্বভাব ও প্রবৃত্তির অদম্য প্রাবল্য ঘটেছিল এবং জেগে উঠেছিল তার ভেতরের ঘুমন্ত হায়েনা। এক কথায় আত্মার ঘটেছিল অপমৃত্যু এবং দেহই ছিল সব কিছুর নিয়ন্তা। বস্তুত সেটা ছিল ধর্ম ও সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারতম যুগ। মানুষ তখন বিবেক-বুদ্ধির সকল বাধা-বন্ধন, ধর্ম ও নৈতিকতার সকল বিধি-নিষেধ ও অনুশাসন পদদলিত করে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল দেহের পাশব ইচ্ছার সর্বপ্লাবী স্রোতে। সে হয়ে পড়েছিল উদর ও প্রবৃত্তির গোলাম। দেহের ক্ষুধা ও দাবী মেটানো এবং পাশব রিপু চরিতার্থ করার জন্য বৈধাবৈধ সর্বপন্থাই সে গ্রহণ করতে সদা প্রস্তুত ছিল। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা মেনে নিতে সে প্রস্তুত ছিল না। এক কথায় দেহের দাবী মেটাতে গিয়ে এমন কোন হীন কাজ

ছিল না যা বনের পশু করতে পারত, অথচ মানুষ পারত না। ফলে দেহের ক্ষুধা এমন সর্বগ্রাসী রূপ ধারণ করল, গোটা পৃথিবীর যাবতীয় সম্পদ-ঐশ্বর্য শুধু একটি আদম সন্তানের লোভ-লালসার আগুন নেভাতেই অপর্যাপ্ত প্রমাণিত হলো। এর স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়াল, মানুষ ভয়ঙ্কররূপে মারমুখী হয়ে উঠল। জুলুম-অবিচার, অন্যায়-অনাচার, নগ্নতা ও পাপাচারের বন্যায় খড়কুটোর ন্যায় ভেসে গেল আত্মা ও বিবেকের শেষ চিহ্নটুকু। মানুষ তখন পরিণত হলো সম্পূর্ণ অপরাধজীবী এক হিংস্র সামাজিক জীবে। রক্তের গন্ধ পেলে নেকড়ে যেমন হিংস্র হয়ে পড়ে, স্বার্থের গন্ধ পেলে মানুষও তেমনি ঝাঁপিয়ে পড়ত নেকড়ের হিংস্রতা নিয়ে। ভিন্ন দেশ ও ভিন্ন জাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল না সে হিংস্রতা, বরং স্বজাতি ও স্বগোত্রীয়রাও কখনও কখনও সে হিংস্রতার নির্মম বলি হতো। আরব কবির ভাষায় ঃ

وَاَحْيَانًا عَلٰى بَكْرٍ اَخِيْنَا - اِنْ لَمْ نَجِدْ اِلَّا اَخَانَا

"আর কোথাও সুযোগ না পেলে নিজেদের ভাই-বেরাদর বনী বকরের ওপরই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ি।"

ইতিহাসের প্রতিটি রক্তাক্ত ঘটনা, দেশ জয় ও যুদ্ধযাত্রা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, জাতীয় অহমিকা, দলীয় সংকীর্ণতা, লোভ-লালসা, সম্পদ লিপ্সা, ক্ষমতার উন্মাদনা ও মদমত্ততা এবং সম্প্রসারণবাদী মানসিকতারই বহিঃপ্রকাশ।[১]

এই পাশবিক চরিত্র যখন মানুষের ধ্যান-ধারণা ও মন-মানসিকতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করে বসে, মানুষের আবেগ-অনুভূতি ও হৃদয়ের সুকুমার বৃত্তিগুলোর ওপর জবরদখল কায়েম করতে সক্ষম হয় এবং গোটা জীবনধারা যখন উদরভিত্তিক ও বস্তুকেন্দ্রিক হয়ে পড়ে, তখন সে তার বল্গাহীন ইচ্ছার পথে কোন অন্তরায় বরদাশ্‌ত করতে পারে না। বিবেকের অনুশাসন ও সতর্কবাণী, ধর্মের উপদেশ ও নীতিকথা তখন মনে হয় চরম অসহনীয় ও বিরক্তিকর। কিয়ামতের কঠিন দিনের হিসাব-কিতাব, জবাবদিহির ধারণা ও জান্নাত-জাহান্নামের শাস্তি ও পুরস্কারের বিশ্বাস মনে হয় হাস্যকর, অলীক কল্পনা।

---

১. ইসলামের জিহাদ ব্যবস্থা এর ব্যতিক্রম। কেননা মানুষের দুর্দশা লাঘব ও মানবতার কল্যাণ সাধনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এছাড়া জিহাদের মাঠে ঘোরতর যুদ্ধের মুহূর্তেও মুসলিম সৈনিকগণ এমন মানবতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন যা অনেক সুসভ্য জাতির পক্ষে শান্তিকালীনও দেওয়া সম্ভব নয়।

সুদীর্ঘ জীবনে একটি মুহূর্তের জন্যও হয়ত সে বিবেকের দংশন অনুভব করে না। অনুভব করে না আত্মার সজীবতা ও হৃদয়ের উষ্ণতা। শরীয়তের বিধি-নিষেধ ও হারাম-হালালের আহকাম তার জন্য এক অস্বস্তিকর বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। ফলে আল্লাহ্‌র যিকির ও ইবাদত-বন্দেগীতে সে উপলব্ধি করতে পারে না কোনরূপ আত্মিক সুখ, অপার্থিব স্বাদ।

আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ۔ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ۔ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۔

“ধৈর্য ও সালাতের আশ্রয় গ্রহণ কর। নিশ্চয় সালাত কঠিন কাজ, কিন্তু ‘খুশুওয়ালাদের’ জন্য নয়। ‘খুশুওয়ালা’ তারা যারা বিশ্বাস করে, অচিরেই তারা স্বীয় প্রতিপালকের সাক্ষাৎ লাভ করবে, স্বীয় প্রতিপালকের কাছে আবার ফিরে যাবে।” [সূরা বাকারা ঃ ৪৫-৪৬]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى ۔ يُرَاءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ اِلَّا قَلِيْلًا ۔

“আর যখন তারা সালাতে দাঁড়ায় তখন নিতান্ত অলসতার সাথে দাঁড়ায়; লোক দেখানোই সার। আল্লাহ্‌র যিকির খুব অল্পই করে।” [সূরা নিসা ঃ ১৪২]

মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও মহত্তম নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় নবুওয়াতের ভূমিকা

বস্তুবাদ ও ভোগবাদের চরম পাশবিকতার বেড়াজালে বন্দী মুমূর্ষু মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ আল্লাহ্ নির্দেশিত পথে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। মানব জাতিকে তাঁরা উদ্ধার করেছেন ধর্মীয় অনাচার, নৈতিক অবক্ষয়, প্রবৃত্তির গোলামি ও আধ্যাত্মিক অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে। মানুষের দেহ. আত্মা, হৃদয় ও মস্তিষ্ককে পূত-পবিত্র করেছেন সকল আবিলতা ও পঙ্কিলতা থেকে। সেই সাথে মানুষকে তাঁরা নতুনভাবে প্রস্তুত করেছেন তার

জীবনোদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য। উন্নত নৈতিকতা ও মহত্তম চরিত্রের মাধ্যমে তাঁরা মানুষকে করেছেন জাগ্রত, জীবন্ত এবং যে মহান দায়িত্ব দিয়ে তাকে পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে, সে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতাও তাঁরা মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছেন। 'ইবাদত, বিলায়াত ও খিলাফত এ তিনটি কাজই প্রত্যেক নবী তাঁর নবুওত কালীন আঞ্জাম দিয়েছেন যুগপতভাবে।

দেহ ও আত্মার মিলিত ও ভারসাম্যপূর্ণ শক্তি ব্যতীত খিলাফতের এ গুরুদায়িত্ব পালন করা মানুষের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই মহাপ্রজ্ঞার অধিকারী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক মানব জাতির আধ্যাত্মিক তরবিয়তের জন্য নাযিল করেছেন সিয়ামের বিধান। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মানুষ তার ভেতরের পাশবিক শক্তি ও ভোগবাদী মানসিকতা কিছু পরিমাণে দমন করতে সক্ষম হয়। নফ্স ও প্রবৃত্তির সকল প্রলোভন ও প্ররোচনার সফল মুকাবিলা ও কার্যকর প্রতিরোধ সৃষ্টি করা অতি সহজ হয়। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তার ঈমান ও আধ্যাত্মিকতা একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি অর্জন করে এবং ঝিমিয়ে পড়া আত্মা পুনরুদ্ধার করে তার হৃত উষ্ণতা, সজীবতা ও উদ্যম। ফলে জীবনের সকল স্তরে দেহ ও আত্মার মাঝে প্রতিষ্ঠিত হয় সমঝোতামূলক ও ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক। এই সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষ তার সুদীর্ঘ জীবনে কয়েকটি মুহূর্তের জন্য হলেও নিজেকে আখলাকে ইলাহী তথা ঐশ্বরিক চরিত্রের প্রকাশস্থলরূপে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। ঊর্ধ্ব জগতের সাথে প্রতিষ্ঠিত হয় ঘনিষ্ঠ ও মজবুত সম্পর্ক। ফলে হৃদয় ও আত্মার প্রশস্ত রাজ্যে এবং ঊর্ধ্ব জগতের অনন্ত ব্যাপকতায় অবাধ বিচরণের যোগ্যতা সে লাভ করে। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে মাটির মানুষ এমন এক ঊর্ধ্ব জাগতিক স্বাদ উপলব্ধি করে, যা নিছক ভোগ-বিলাস কিংবা উদরপূর্তির মাধ্যমে কল্পনাও করা সম্ভব নয়।

সিয়ামের উদ্দেশ্য ও জীবনের ওপর তার প্রভাব

মহাত্মা ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর স্বভাবসুলভ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে সিয়ামের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"আখলাকে ইলাহী তথা আল্লাহর গুণে মানুষকে গুণান্বিত করে তোলাই হচ্ছে সিয়ামের উদ্দেশ্য। সিয়াম মানুষকে ফিরিশতাদের অনুকরণের মাধ্যমে যতদূর সম্ভব নিজেকে প্রবৃত্তির গোলামি থেকে মুক্ত হওয়ার শিক্ষা দেয়। কেননা

ফিরিশতাগণ সকল চাহিদা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং মানুষের মর্যাদাও হচ্ছে পশুর চেয়ে বহু উর্ধ্বে। জৈবিক চাহিদা মুকাবিলা করার জন্য তাকে দান করা হয়েছে বিবেক ও বুদ্ধির আলো। অবশ্য এদিক দিয়ে তার স্থান ফিরিশতাদের নীচে। জৈবিক চাহিদা ও পাশবিক কামনা অনেক সময় তার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় এবং তার ভেতরের এ পশুত্ব দমন করতে তাকে কঠোর সাধনা ও মুজাহাদা করতে হয়। তাই মানুষ যখন পাশবিক ইচ্ছার সুতীব্র স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়, তখন সে নেমে যায় অধঃপতনের নিম্নতম স্থানে। অরণ্যের পশু আর লোকালয়ের মানুষে কোন প্রভেদ থাকে না তখন। আর যখন সে তার পাশবিকতা দমন করতে সক্ষম হয়, তখন তার স্থান নির্ধারিত হয় নূরের ফিরিশতাদেরও ওপরে।" [এহয়াউল উলুম, খ. ১, পৃ. ২১২]

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম এ বিষয়ের ওপর আরো বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন। তাঁর ভাষায় ঃ

"সিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে তার পাশবিক ইচ্ছা ও জৈবিক অভ্যাস থেকে মুক্ত করা এবং জৈবিক অভ্যাস ও চাহিদাসমূহের মধ্যে সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত করা। সিয়াম সাধনার মাধ্যমেই মানুষ আত্মশুদ্ধি ও পবিত্রতা অর্জন করে। চিরন্তন জীবনের অনন্ত সফলতার স্বর্ণ শিখরে আরোহণ করে। ক্ষুধা-পিপাসার কারণে জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছাতে ভাটা পড়ে। পশুত্ব নিস্তেজ হয়ে যায়। মনুষ্যত্ব জাগ্রত হয় এবং দারিদ্র্য-পীড়িত অগণিত আদম সন্তানের অনাহারক্লিষ্ট মুখ তখন তার অন্তরে সহানুভূতির উদ্রেক করে। অন্তর বিগলিত হয় মহান রাব্বুল আলামীনের প্রতি কৃতজ্ঞতায়।

"সিয়াম শয়তানের সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়। মানুষের সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে হিফাজত করে দুনিয়া ও আখিরাত বিনষ্টকারী কাজ থেকে। বস্তুত সিয়াম হচ্ছে মুত্তাকীদের (আল্লাহ্‌ভীরুদের) জন্য লাগামস্বরূপ। সিয়াম এমন এক মজবুত ঢাল যা মানুষকে শয়তানের সকল আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করে।"

সিয়ামের অন্যান্য উপকারিতা ও কল্যাণের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"মানুষের শারীরিক ও আত্মিক শক্তি হিফাজত করার ক্ষেত্রে সিয়াম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। বিভিন্ন ক্ষতিকর উপসর্গ থেকে মানুষকে সে রক্ষা করে। পাশবিক চাহিদার প্রাবল্য যা মানুষের স্বাস্থ্য ধ্বংস করে, তা থেকে মুক্তি দেয়। দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য সিয়াম যেমন উপকারী, তদ্রূপ পবিত্র জীবন যাপনের পক্ষেও তা খুবই সহায়ক। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে।" [সূরা আল্-বাকারা ঃ ১৮৩]

আল্লাহ্র পেয়ারা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"মুমিনের জন্য সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ।"

"এজন্যই আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে বিবাহে অপারগ ব্যক্তিদেরকে সিয়ামের পরামর্শ দেয়া হয়েছে। মোটকথা, সিয়ামের হিকমত ও উপকারিতা জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির কষ্টি পাথরে প্রমাণিত ও সার্বজনীন স্বীকৃত সত্য। আল্লাহ্ পাক বান্দার কল্যাণের জন্যই শুধু নিজ দয়া ও রহমত গুণে আমাদের ওপর এ সিয়াম ফরয করেছেন।" [যাদুল মা'আদ, খ. ১, পৃ. ১৬৮]

সিয়ামের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম আরো লিখেছেন ঃ

"কলবের ইসলাহ্ ও চরিত্র সংশোধন নির্ভর করে সকল মনোযোগ আল্লাহ্র দিকে কেন্দ্রীভূত করার ওপর। 'তাওয়াজ্জুহ ইলাল্লাহ্ বা আল্লাহ্ কেন্দ্রিকতা' মানুষের অন্তরে স্থির প্রশান্তি এনে দেয়। পক্ষান্তরে পানাহারের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত আসক্তি, অযথা গল্প-গুজব ও সংশ্রব তা বিনষ্ট করে। ফলে আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং মানুষ সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গোমরাহীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে।"

অন্যান্য ধর্মে সিয়াম (রোযা)

পৃথিবীর যে সকল ধর্মে আমরা সিয়ামের সন্ধান পাই তার মধ্যে ভারতের হিন্দু ধর্ম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মত, পথ ও বিশ্বাসের আকাশ-পাতাল পার্থক্য সত্ত্বেও ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ হিন্দু ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত।

হিন্দু ধর্মের সুযোগ্য প্রতিনিধিত্বকারী, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান T.M.P. MAHADEVAN হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজে সিয়ামের তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"ফি বছর অনুষ্ঠিত বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পর্বের মধ্যে কয়েকটি পর্ব রোযার (উপবাসব্রত) জন্য নির্দিষ্ট রাখা হয়েছে। এ সব উপবাসব্রতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আত্মশুদ্ধি লাভ। প্রতিটি হিন্দু উপদলের উপাসনা ও উপবাসব্রতের জন্য পৃথক দিন-সময় নির্ধারিত রয়েছে। তখন তারা সারা দিন উপবাস ব্রত পালন করে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ কিংবা ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বিনিদ্র রাত যাপন করে। তবে সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর নিকট গ্রহণযোগ্য ও সার্বজনীন পর্ব হচ্ছে বৈষ্ণব-এর নামে অনুষ্ঠিত 'একাদশীর উপবাসব্রত'। অবশ্য বিষ্ণু ভক্তরা বাদে অন্য হিন্দুরাও নিষ্ঠার সাথে এ ব্রত পালন করে থাকে। এ পর্বটিতে হিন্দুরা দিনে উপবাসব্রত ও রাতে পূজা-অর্চনায় নিমগ্ন থাকে।

"কয়েকটি পর্ব শুধু হিন্দু নারীদেরই পালনীয়। এ পর্বগুলোকে বিশেষ গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণে 'ব্রত' নামে আখ্যায়িত করা হয়। এ সকল পর্বে হিন্দু নারিগণ ঈশ্বরের নারী চরিত্রের বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্বকারী দেবদেবীর পূজা-অর্চনা করে থাকেন। এ সব ব্রতের উদ্দেশ্য হচ্ছে আধ্যাত্মিক ও ঐশ্বরিক শক্তিতে নিজেকে বলীয়ান করা।"

(OUTLINES OF HINDUISM. CHAPTER 4, SECTION 6.)

মাওলানা মরহুম সাইয়েদ সুলায়মান নদভী তাঁর সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে ইন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বরাত দিয়ে লিখেছেন ঃ

"প্রাচীন মিসরীয়দের ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতেও সিয়ামের প্রচলন পাওয়া যায়। তবে তা সাধারণ অনুসারীদের জন্য ফরয বা অবশ্য পালনীয় নয়। পারসিকদের ধর্মগ্রন্থের কোন কোন শ্লোক থেকে প্রমাণিত হয়, ধর্ম প্রধানদের জন্য পাঁচসালা উপবাসব্রত অবশ্য পালনীয় ছিল।" [সীরাতুন্নবী—খ. ৫, পৃ. ১১২]

ইয়াহূদী ধর্ম

ব্যাবেলনীয় যুগে ইয়াহূদী ধর্মাবলম্বীদের নিকট সিয়াম ছিল বিপদ ও শোকের প্রতীক। যখন কোন বিপদ ও দুর্যোগের আশংকা দেখা দিত, তখনই ধর্মীয়ভাবে উপবাসব্রত পালন করা হতো। আধ্যাত্মিক পুরুষগণও ঐশী বাণী লাভের প্রত্যাশায় সিয়াম পালন করতেন। এছাড়াও যখন মনে করা হতো, প্রভু ইসরাঈলীদের ওপর রুষ্ট হয়েছেন কিংবা দেশে যখন রোগ মহামারী দেখা দিত, জাতীয় পর্যায়ে কোন দুর্যোগ-দুর্ভিক্ষ নেমে আসত কিংবা বাদশাহ যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ মিশনে রওয়ানা হতেন তখনও সিয়াম রাখার নির্দেশ ইয়াহূদী ধর্মশাস্ত্রে রয়েছে।

'প্রায়শ্চিত্ত সিয়াম' ছাড়াও ইয়াহূদীদের ধর্মীয় ক্যালেন্ডারে সিয়ামের আরো কতগুলো দিন নির্ধারিত রয়েছে। আর রয়েছে অতীতের বিভিন্ন 'জাতীয় দুর্যোগ ও শোকের স্মৃতিবাহক' সিয়াম। যেমন বাবেলে বন্দীকালীন স্মরণে চতুর্থ মাস (মে), পঞ্চম মাস (জুন), ষষ্ঠ মাস (তিশরী) ও দশম মাসের (তিব্বত) সিয়াম। তালিমুদের কোন কোন ধর্ম পণ্ডিতের মতে এ দীর্ঘ সিয়াম শুধু তখনই অবশ্য পালনীয়, যখন ইয়াহূদী জাতি কোন বহিঃশক্তি দ্বারা পদানত হয় কিংবা হানাদার বাহিনীর নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সময়ে এ সিয়াম সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক।

পরে অবশ্য ইয়াহূদীদের বিভিন্ন জাতীয় শোক, দুর্যোগ ও বেদনাপূর্ণ ঘটনার স্মরণে আরো কিছু সংখ্যক সিয়াম সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু সেগুলো বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। অন্যান্য সিয়ামের ন্যায় সেগুলো অবশ্য পালনীয়ও নয়। সামান্য মতপার্থক্যসহ এ সিয়ামের সংখ্যা হচ্ছে পঁচিশ।

এ ছাড়া অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ইয়াহূদী জনবসতিতে বিচ্ছিন্ন কিছু সিয়ামেরও সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলোর সম্পর্ক হচ্ছে বিভিন্ন আঞ্চলিক আনন্দময় ও বেদনাময় ঘটনা-দুর্ঘটনার সাথে। ইয়াহূদী ধর্মনেতাগণও মাঝে মধ্যে বিভিন্ন উপলক্ষে[১] জনসাধারণের ওপর সিয়াম ফরয করে থাকেন এবং এ সিয়াম ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেই অবশ্য পালনীয়। কেননা ধর্ম নেতাদের এ অধিকার ধর্মীয়ভাবেই স্বীকৃত।

---

[১] যেমন দুর্ভিক্ষ, মহামারীর সময় কিংবা শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার সময় কিংবা শাসকের নির্যাতনমূলক আইন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ। (১৯৬৭-এর যুদ্ধে ইয়াহূদী ধর্ম নেতাগণ জাতীয় পর্যায়ে সিয়াম পানের নির্দেশ জারি করেছিলেন। অপরদিকে মিসরীয় সামরিক অফিসারগণ মদ ও মেয়ে নিয়ে এতই ব্যস্ত ছিলেন যে, আক্রমণের আকস্মিতা কাটিয়ে উঠতেই তাদের বেশ সময় লেগেছিল।- অনুবাদক

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক উপলক্ষেও সিয়াম রাখার বিধান রয়েছে। ব্যক্তিগত কিংবা পারিবারিক কোন ঘটনা স্মরণে, কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ ও বিপদ-মুসীবতের মুহূর্তে ঈশ্বরের অনুকম্পা লাভের প্রত্যাশায় এ সিয়াম পালন করা হয়। অবশ্য ইয়াহূদী ধর্মবেত্তাগণ এ জন্য কয়েকটি শর্ত আরোপ করেছেন। কোন আলিম (ধর্ম-পণ্ডিত) ও বিশিষ্ট ধর্মীয় ব্যক্তির পক্ষে এ ধরনের সিয়াম রাখা নিষিদ্ধ। কেননা স্বাস্থ্যের ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ফলে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টির আশংকা রয়েছে।

সাধারণত ইয়াহূদীদের সিয়াম শুরু হয় সকালে সূর্য বেশ কিছু ওপরে ওঠার পর থেকে এবং তা শেষ হয় রাতের প্রথম তারা উদয়ের পর। তবে কাফফারা বা প্রায়শ্চিত্ত সিয়ামের (যা মে মাসের নবম তারিখে রাখা হয়) সময়সীমা হচ্ছে এক সন্ধ্যা থেকে আরেক সন্ধ্যা। সিয়ামের জন্য কোন সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান ইয়াহূদী ধর্মে খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে সিয়াম অবস্থায় দান-খয়রাত ও গরীব-মিসকীনের মধ্যে খাদ্য বিতরণের কথা বলা হয়েছে এবং এর জন্য বিরাট বিরাট পুণ্যের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

'আব' মাসের প্রথম নয় দিন এবং তামুজের সতের তারিখে আংশিক সিয়ামের বিধান রয়েছে। এ ক'দিন শুধু মদ ও গোশ্‌ত নিষিদ্ধ, অন্য কিছু নয় (Jewish Encyclopaedia)।

খ্রিস্ট ধর্ম

এ কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, খ্রিস্ট ধর্মের সকল প্রামাণ্য গ্রন্থ চষে ফেলার পরও সিয়ামের সঠিক রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণা অর্জন করা বেশ দুরূহ ব্যাপার। কেননা যুগ বিবর্তনের সাথে সাথে সামাজিক ও নৈতিক প্রভাবে সিয়ামের আহকাম ও বিধি–বিধানের মধ্যেও বারবার বড় ধরনের রদবদল সাধিত হয়েছে। তাই সিয়ামের আইন-কানুনকে ধর্মীয় বিধান বা ঐশী ব্যবস্থারূপে স্বীকার করা সহজ নয়। তবু এখানে আমরা সিয়ামের রূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা উদ্ধারের প্রয়াস পাব। সময়ের বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে সিয়ামের বিধানসমূহের মধ্যে যুগে যুগে যে সব পরিবর্তন এসেছে সে সম্পর্কেও একটা ধারণা পেশ করার চেষ্টা করব।

নবুওত প্রাপ্তির পূর্বে হযরত ঈসা আলায়হিস্‌সালাম চল্লিশ দিনব্যাপী সিয়াম পালন করেছেন। আসলে এটা ছিল ইয়াহূদীদের প্রায়শ্চিত্ত সিয়াম, ইয়াহূদী ধর্ম মতে এটা ফরয। অবশ্য একজন নিষ্ঠাবান ইয়াহূদীর মতই তিনি এ সিয়াম পালন করতেন। কয়েকটি মৌলিক উপদেশ ও নীতিকথা ছাড়া তিনি নিজে সিয়ামের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিধি-বিধান রেখে যান নি, বরং গির্জা ও চার্চের ওপর সে দায়িত্ব ন্যস্ত করে গেছেন। তাই কোন খ্রিস্টান একথা দাবী করতে পারে না, সিয়ামের বিধানসমূহ স্বয়ং হযরত ঈসা আলায়হিস্‌সালাম কর্তৃক প্রবর্তিত। পলের সুসমাচারে সিয়ামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেখানে এও উল্লেখ করা হয়েছে, প্রথম দিকে ইয়াহূদী বংশোদ্ভূত খ্রিস্টানগণ বরাবর প্রায়শ্চিত্ত সিয়াম পালন করতো। পাদ্রী লুক বিশেষ গুরুত্বের সাথে এর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু অন্যান্য খ্রিস্টান সিয়ামের প্রতি ততটা যত্নবান নন।

পলের মৃত্যুর প্রায় দেড় শ' বছর পর খ্রিস্ট জগতে সিয়ামের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সুবিন্যস্তকরণের প্রয়োজনীয়তা সুতীব্রভাবে অনুভূত হয়। খ্রিস্টান পাদ্রী ও চার্চ প্রধানগণ যৌন উচ্ছ্বাসের মুকাবিলায়ও সিয়ামের পরামর্শ দিতেন। তখন বেশ গুরুত্বের সাথে এ কথা বিবেচনা করা হতো, সিয়াম যেন প্রাণহীন অনুষ্ঠানসর্বস্ব কোন বিধানে পরিণত না হয় যা মানুষের স্বভাব ও চরিত্রে কোন ছাপ ফেলতে সক্ষম নয়।

পাদ্রী 'এরিনিয়াস' সিয়ামের প্রকারভেদ উল্লেখ করে বলেছেন ঃ সিয়াম কখনও একদিন, কখনও দু'দিন, আবার কখনও বা চল্লিশ ঘণ্টাব্যাপী হতো। এ ব্যবস্থা বেশ কিছুদিন বলবৎ ছিল। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে ক্রুসেডের সিয়াম কোন কোন অঞ্চলে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তদ্রূপ খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করার জন্যও এক-দু'দিন সিয়াম রাখার প্রচলন ছিল। দীক্ষা প্রদানকারী ও খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণকারী উভয়েই এ সিয়াম রাখতেন। সিয়ামের পদ্ধতি ও নিয়মাবলী সম্পর্কে খ্রিস্টানদের বিভিন্ন ফিরকা দল-উপদলে কিঞ্চিৎ মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।[১]

সিয়ামের বিধি-বিধান প্রণয়ন ও সুবিন্যস্তকরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন হয় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে। তখন কেন্দ্রীয় চার্চের পক্ষ থেকে সিয়াম সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশসম্বলিত একটি বুলেটিন প্রকাশ

---

[১] দেখুন ইনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়নস এণ্ড ইথিক্‌স।

করা হয়। চতুর্থ শতাব্দীতে সিয়ামের বিধানসমূহে কঠোরতা ও কড়াকড়ি ভাব বেশ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। পূর্বেকার উদারতা, শিথিলতা ও আকর্ষণ এ শতাব্দীতে এসে সম্পূর্ণ অন্তর্নিহিত হয়। সিয়ামের সমাপ্তি সময় নিয়ে বেশ মতবিরোধ ছিল।

চল্লিশ দিনব্যাপী সিয়ামের কোন সন্ধান চতুর্থ শতাব্দী পর্যন্ত পাওয়া যায় না। দেশের ভৌগোলিক আবহাওয়া ও পরিবেশগত পার্থক্য সিয়ামের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। রোমানদের সিয়াম ইসকান্দারীয় ও অন্যান্য অঞ্চলের খ্রিস্টানদের সিয়াম থেকে বেশ স্বতন্ত্র ছিল। কেউ গবাদি পশুর গোশ্‌ত নিষিদ্ধ মনে করতো, কেউ আবার মাছ ও পাখীর গোশ্‌ত নিষিদ্ধ মনে করতো। আবার কারো ধারণা ছিল, ডিম ও ফল খাওয়া চলবে না। আবার কারো মতে এ সবই নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত। এমনি আজব তফাত ছিল এক অঞ্চলের সিয়ামের সাথে অন্য অঞ্চলের সিয়ামের।

আরো পরে এসে হযরত ঈসা আলায়হিস্‌সালামের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে এবং খ্রিস্ট জগতের ঐতিহাসিক দিন উপলক্ষে বেশ কিছু সিয়ামের প্রচলন হয়, কালের বিবর্তনের সাথে পাল্লা দিয়ে সেগুলোর আকৃতি-প্রকৃতিও বদলাতে থাকে।

সংস্কার যুগ শেষ হওয়ার পর ইংল্যান্ডের চার্চ সিয়ামের দিনসমূহ নির্ধারণ করে দেয়। কিন্তু সিয়ামের নিয়মাবলী, আইন-কানুন ও সীমা সম্পর্কে কোন নির্দেশ জারি করেনি, বরং তা ব্যক্তির বিবেক ও ধর্মীয় দায়িত্ববোধের ওপর ছেড়ে দেয়া হয়। তবে ষষ্ঠ এডওয়ার্ড, প্রথম জেমস ও এলিজাবেথের সময় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট এই মর্মে একটি আইন পাস করে, সিয়ামের দিনগুলোতে গোশ্‌ত খাওয়া যাবে না। এই আইন পাস করার পেছনে পার্লামেন্টের যুক্তি হিসেবে দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্ন উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজন ছিল।

[দেখুন খ্রিস্ট ধর্মের সিয়াম। ইনঃ রিলিঃ এ্যাথিঃ]

এ কারণেই মুসলমানদের ওপর সিয়ামের বিধান নাযিল করার সময় আল্‌-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হলো যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। [সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৩]

সিয়ামের প্রকৃতি নির্ধারণে অবাধ স্বাধীনতার কুফল

ইসলাম-পূর্ব ধর্মসমূহে সিয়ামের দিন, সময়, সংখ্যা ও প্রকৃতি নির্ধারণের ব্যাপারে বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট কোন বিধি-বিধানের সন্ধান পাওয়া যায় না। মানুষের ইচ্ছা-মর্জি ও খেয়াল-খুশীর ওপরই তা ছেড়ে দেয়া হয়েছে। ফলে সকলেই নিজ নিজ সুযোগ-সুবিধা বুঝে সিয়ামের দিন, সময় ইত্যাদি নির্ধারণ করতে পারত। তদ্রূপ পূর্ণ সিয়াম কিংবা আংশিক সিয়াম রাখার এখতিয়ারও ছিল তাদের অর্থাৎ যাবতীয় পানাহার বর্জন করার যেমন এখতিয়ার ছিল, তেমনি এখতিয়ার ছিল শুধু বিশেষ কয়েকটি জিনিস বর্জন করার। অবশ্য ধর্মের পক্ষ থেকে বিশেষ কয়েকটি জিনিস বর্জন, অপর কয়েকটি জিনিস গ্রহণের নির্দেশ ছিল। কোন কোন ভারতীয় ধর্মে এর নজির পাওয়া যায়। কেউ হয়ত গোশ্‌ত জাতীয় খাদ্য বর্জন করা জরুরী মনে করত, আর কেউ হয়ত আগুনস্পৃষ্টতায় খাদ্য পরিহার করে রোযা রাখত। আবার কেউ হয়ত লবণমিশ্রিত পানীয় ও এ ধরনের সাধারণ জিনিস ব্যতীত অন্য সকল কিছু বর্জন করা জরুরী মনে করত। গান্ধী ও তার অনুসারীদের 'ব্রত' শেষোক্ত পর্যায়ের ছিল।

এই অবাধ স্বাধীনতা প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের ভাবমূর্তি ও তার প্রাণশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। চারিত্রিক মহত্ত্ব, নৈতিক শুচিতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, আত্মিক পবিত্রতা ও আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম এই সিয়াম কালক্রমে অন্তঃসারশূন্য নিছক এক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়ে পড়েছিল।

যেহেতু যাবতীয় এখতিয়ার মানুষের হাতেই অর্পিত হয়েছিল, সেহেতু খাদ্যের পরিমাণ সংকোচন, বিশেষ কোন খাদ্য গ্রহণ ও বর্জন, সময় ও সংখ্যা নির্ধারণ-- এক কথায় সিয়ামের যাবতীয় বিষয়ই ছিল মানুষের ইচ্ছাধীন। ফলে তার মধ্যে অবহেলা, অলসতা ও ফাঁকিবাজির অভ্যাস গড়ে উঠল। একটি মহান ধর্মীয় বিধান মানুষের খেয়ালিপনা ও ইচ্ছা-মর্জির শিকার হয়ে পড়ল। তার রশি টেনে ধরার মত কোন উচ্চতর শক্তি ছিল না সেখানে। কেননা সিয়াম পালনকারীকে যদি একথা বলা হতো, সিয়াম পালনের দিনে কিভাবে তুমি দিব্যি

পানাহার চালিয়ে যাচ্ছ? তখন খুব সহজেই সে এ উত্তর দিতে পারত, আমার সিয়াম তো সবেমাত্র শুরু হলো কিংবা আমার সিয়াম শেষ হয়ে গেছে। এ কারণেই পূর্বতন ধর্মের অনুসারীরা সিয়ামের আত্মিক, নৈতিক তথা সর্ববিধ কল্যাণ থেকে বঞ্চিত ছিল। আরো সোজা কথায়, সিয়ামের প্রকৃত মর্ম ও হাকীকতই তাদের হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। সিয়ামের যাবতীয় বিধি-বিধান শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত করে দেয়ার সবচেয়ে বড় হিকমত ও তাৎপর্য মূলত এটাই।

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর অমর গ্রন্থ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'য় লিখেছেন :

> "সিয়ামের ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া হলে ব্যাখ্যা ও পলায়নের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাবে। সৎ কাজের নির্দেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ইসলামের এই সর্বাপেক্ষা বড় 'আনুগত্য' অলসতার শিকার হয়ে যাবে।" [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৭]

সিয়ামের পরিমাণ ও সংখ্যা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন :

"এর সময়সীমা নির্ধারণের বিষয়টিও জরুরী, যাতে করে সংকীর্ণতা ও শিথিলতার সুযোগ না থাকে। যদি এমনটি না হতো তাহলে সিয়ামের ওপর কেউ হয়ত এমন আমল করে বসত, যাতে তার কোন উপকার হতো না। তার ওপর সিয়ামের কোন ছাপ পড়ত না। কেউ বা অতিরঞ্জিতভাবে সিয়ামের প্রতি এত বেশী ঝুঁকে পড়ত যা তাকে নিজস্ব ক্ষমতার বাইরে নিয়ে যেত। ফলে সে আধ-মরা হয়ে পড়ে থাকত। প্রকৃতপক্ষে সিয়াম একটি প্রতিষেধক যা প্রবৃত্তির বিষাক্ত উপাদান বিনাশ করার জন্য সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অতএব, মাত্রা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী।"

খাদ্য সংকোচন না বর্জন?

শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ রহমাতুল্লাহি আলায়হি উভয় প্রকার সিয়ামের (এক প্রকার সিয়াম হলো যেখানে পানাহারসহ সিয়ামের উদ্দেশের পরিপন্থী যাবতীয় বিষয় সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়। অন্য প্রকার সিয়াম হলো যেখানে শুধু আংশিক বর্জন করা হয়) মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মনস্তত্ত্বের আলোকে এ কথা প্রমাণিত করেছেন, সকল প্রকার দৈহিক চাহিদা নিয়ন্ত্রণ, যাবতীয় পানাহার

সম্পূর্ণরূপে বর্জনই সিয়ামের হিকমত ও উদ্দেশ্য অর্জনে সহায়ক। পক্ষান্তরে খাদ্য সংকোচনের মাধ্যমে আংশিক সিয়াম পালন সব দিক থেকেই সিয়ামের হিকমত ও উদ্দেশ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। তিনি লিখেছেন ঃ

"খাদ্য সংকোচনের পন্থা দু'টি। প্রথমত খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া কিংবা বিশেষ বিশেষ খাদ্য বর্জন করা। দ্বিতীয়ত দুই খানার মধ্যবর্তী সময় স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘ করে দেয়া যা সিয়ামের উদ্দেশ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।"

"ইসলামী শরীয়ত এই শেষোক্ত পন্থাই অবলম্বন করেছে। কেননা এ উপায়েই শুধু দেহ ক্ষুধা ও পিপাসার দাহন অনুভব করতে পারে এবং মানুষের জৈবিক চাহিদা নিস্তেজ হতে পারে। পারে তার ভেতরের পাশবিকতা দুর্বল হতে। পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত সুরতে খাদ্য গ্রহণ স্বাভাবিক মাত্রায় অব্যাহত থাকার ফলে–পরিমাণ যত কিঞ্চিৎই হোক–দেহে ক্ষুধা ও পিপাসার প্রভাব পরিপূর্ণরূপে অনুভূত হয় না। ভেতরের পশুটি তার সকল প্রকার পাশবিকতা নিয়েই বহাল তবিয়তে থেকে যায়। এছাড়া এ ধরনের সিয়ামের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন বিধান প্রণয়ন খুবই দুরূহ ব্যাপার। কেননা দৈহিক চাহিদা ও খাদ্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে সকলে একই শ্রেণীভুক্ত নয়। কেউ হয়ত এক পোয়া খেতে পারে না, আবার কেউ আধা সের খাদ্য হজম করে ঘুরে বেড়ায় দিব্যি আরামে। এমতাবস্থায় শরীয়তের পক্ষ থেকে খাদ্য সংকোচনের পরিমাণ নির্ধারণ করে দিলে তা একজনের জন্য যদি হয় অনুকূল, তবে অপরজনের জন্য হবে প্রতিকূল।"

সিয়ামের সময়সূচী নির্ধারণের হিকমত ও তাৎপর্য বর্ণনা প্রসংগে শাহ্ সাহেব লিখেছেন ঃ

"সিয়ামের সময় এতটা দীর্ঘ হওয়া একেবারেই অযৌক্তিক যা সাধারণ মানুষের প্রায় সাধ্যের বাইরে। যেমন বিরতিহীনভাবে একটানা তিনদিন তিনরাত সিয়াম পালন করা। কেননা সাধ্যাতিরিক্ত কোন কষ্টকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা শরীয়তের উদ্দেশ্য ও হিকমতের পরিপন্থী। আর সাধারণভাবে এর ওপর আমল করাও সম্ভব নয়।"

ধারাবাহিক ও বিক্ষিপ্ত সিয়াম

প্রাচীন ধর্মসমূহে ধারাবাহিক সিয়ামের কোন বিধান ছিল না, বরং বছরের বিভিন্ন দিন বিক্ষিপ্তভাবে সিয়াম পালনের প্রথাই চালু ছিল। উপরন্তু দুই সিয়ামের

মধ্যবর্তী সময়টুকু এতো দীর্ঘ হতো যে, মানব জীবনে সিয়ামের কোন প্রভাবই তখন আর অনুভূত হতে পারত না। ভেতরের পাশবিক রিপুগুলো দমিত হওয়ার পরিবর্তে তা আরো উস্‌কে যেত এবং মানুষের ধ্যান-ধারণা, মন-মানসিকতা ও আবেগ অনুভূতিকে পবিত্র, বিশুদ্ধ ও নির্মল করার পূর্বেই সিয়ামের মেয়াদ ফুরিয়ে যেত। ফলে প্রাচীন ধর্মসমূহ কার্যত সিয়ামের বেশী ফল লাভ থেকে বঞ্চিতই ছিল। এজন্য বিক্ষিপ্ত সিয়ামের পরিবর্তে ধারাবাহিক সিয়ামের বিধানই ছিল মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির একান্ত দাবি। একমাত্র ইসলাম স্বভাব ও ফিতরতের আবেদনে সাড়া দিয়ে নাযিল করেছে দীর্ঘ এক মাসব্যাপী ধারাবাহিক সিয়ামের বিধান। আত্মিক, নৈতিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক উৎকর্ষের যে মহান লক্ষ্যে নাযিল হয়েছিল সিয়ামের ঐশী বিধান, একমাত্র ইসলামী সিয়ামেই তা সংরক্ষিত হয়েছে পুরোপুরি।

সিয়ামের ধারাবাহিকতার হিকমত ও তাৎপর্য সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন ঃ

"আত্মিক উৎকর্ষ তথা নিরংকুশ আনুগত্যের ফলপ্রসূ অনুশীলনের জন্য বিক্ষিপ্ত পানাহার বর্জনের পরিবর্তে ধারাবাহিক সিয়ামের বিধানই ছিল অপরিহার্য। কেননা দু'-একবারের অনশন ব্রত যত কঠোর ও দীর্ঘই হোক, মানুষের জন্য কাঙ্ক্ষিত সুফল বয়ে আনতে সক্ষম নয়।"

[হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ খণ্ড ২, পৃ. ৩৭]

রমাযানুল মুবারকের সিয়াম ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার সিয়াম পালনের নির্দেশ ছিল মুসলমানদের ওপর। হিজাযের গুটি কয়েক আরবগোত্র ও আরব ইয়াহূদীদের মধ্যেও আশুরার সিয়ামের প্রচলন ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আশুরার বিষয়টি কিঞ্চিৎ বিস্তারিত আলোচনার দাবী রাখে।

আশুরার সিয়াম

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"মদীনায় হিজরতের পর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার সিয়াম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এটা কিসের

দিন? বলা হলো, এই দিনে বনী ইসরাঈলদের আল্লাহ্ শত্রুর কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন এবং হযরত মূসা (আ.) এ দিনটির স্মরণে সিয়াম পালন করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, মূসার ব্যাপারে আমি তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার। অতঃপর তিনি আশুরার সিয়াম পালন করলেন এবং অন্য সকলকে সে নির্দেশ দিলেন।"

মুসলিম শরীফের রিওয়ায়েতে আছে, "এটা এক মহান দিন। এই দিনে আল্লাহ্ মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছেন এবং ফিরাউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন। আল্লাহর এই অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ হযরত মূসা (আ.) সেদিন সিয়াম রেখেছিলেন। হিজরত অধ্যায়ে ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি আবূ বাছীর রাদিয়াল্লাহু আনহুর রিওয়ায়েতে এ কথাটুকুও যোগ করেছেন, "আমরাও মূসার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক এই দিনে সিয়াম পালন করি।" ইমাম মুসলিম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে রিওয়ায়েত করেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন। তখন তিনি দেখলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার সিয়াম পালন করে। এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তারা জানাল, এটা সেই দিন যেদিন মূসা ও বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ ফিরাউনের ওপর বিজয়ী করেছিলেন। সেজন্য আমরা তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনপূর্বক এ দিনটিতে সিয়াম পালন করি। রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ "আমরা মূসার বিষয়ে তোমাদের চেয়ে বেশী হকদার। অতঃপর তিনি আশুরার সিয়ামের নির্দেশ দিলেন।" তাবারানী রিওয়ায়েত করেছেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন, তখন তিনি দেখলেন, ইয়াহূদীরা আশুরার সিয়াম পালন করে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন্ দিন? তারা বলল, এটা আশুরার দিন। এ দিনেই মূসা (আ.) ফিরাউনের কবল থেকে নাজাত পেয়েছেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ মূসাকে অনুসরণ করার ব্যাপারে আমরা বেশী হকদার।

সুপ্রসিদ্ধ গণিতশাস্ত্রবিশারদ আবূ রায়হান আল-বেরুনী (মৃ. ৪৪০ হি.) এর সম্ভাব্যতা অস্বীকার করেছেন এবং ইয়াহূদী বর্ষপঞ্জি ও আরবী বর্ষপঞ্জির তুলনামূলক আলোচনার পর উপরিউক্ত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতায় সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ الاثار الباقية عن القرون الخالية (বিগত যুগের স্মৃতি-অবশেষ) গ্রন্থে লিখেছেন,

"বলা যায়, আশুরা শব্দটি আরবীতে হিব্রু ভাষা থেকে এসেছে। ইয়াহূদী বর্ষপঞ্জির 'তিসরি' মাসের দশম দিবসকে বলা হয় আশুরা।[১] এ দিনের সিয়ামকে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় পরিভাষায় বলা হয় প্রায়শ্চিত্ত রোযা। ইয়াহূদী ধর্মগ্রন্থে এজন্য YOM KIPPUR শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যার ইংরেজী তরজমা দাঁড়ায় DAY OF ATONEMENT। এটাকে আরবী মাসের হিসাবে গণনা করে আরবী বর্ষপঞ্জির প্রথম মাসের দশম দিবসরূপে সাব্যস্ত করা হলো। অনুরূপভাবে এটা ইয়াহূদী বর্ষপঞ্জিরও প্রথম মাসের দশম দিন ছিল। আশুরার সিয়াম হিজরতের প্রথম বছরেই ফরয হয়েছিল। পরে রমাযানুল মুবারকের সিয়ামের মাধ্যমে তা রহিত (মনসূখ) হয়ে যায়। একটি রিওয়ায়েতে এরূপ আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় তশরীফ আনলেন এবং দেখলেন ইয়াহূদীরা আশুরার সিয়াম রাখে, তখন তিনি সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা বলল, এটা সেই দিন যেদিন আল্লাহ্ তা'আলা ফিরাউন ও তার কওমকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন এবং মূসা (আ.) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছেন। এ কথা শুনে তিনি ইরশাদ করলেন, আমরা মূসার বিষয়ে তাদের চেয়ে বেশী হকদার। অতঃপর তিনি সেদিন রোযা রাখলেন এবং সাহাবাগণকেও সে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু যখন রমাযানুল মুবারকের সিয়াম ফরয হলো, তখন তিনি আশুরার সিয়ামের ব্যাপারে নির্দেশ যেমন দেন নি, তেমনি নিষেধও করেন নি।"

কিন্তু এতদসম্পর্কিত হাদীসগুলো বিশুদ্ধ নয়। গবেষণালব্ধ প্রমাণ তার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত প্রকাশ করছে। কেননা হিজরতের প্রথম বছরের প্রথম দিনটি ছিল শুক্রবার মুতাবিক ১৬ই তামুজ, ৯৩৩ ইসকান্দারীয় বর্ষপঞ্জি। অন্যদিকে ইয়াহূদী বর্ষপঞ্জি হিসেবে সেই বছরের প্রথম দিনটি ১২ই আউয়াল রোববার মুতাবিক ২৯শে সফর। সে হিসাবে আশুরার সিয়াম রবিউল আওয়ালের নয় তারিখে মঙ্গলবার হওয়া উচিত। আর রাসূলুল্লাহ্‌র হিজরতও হয়েছিল রবিউল আওয়ালের প্রথমার্ধেই। এই দুই তারিখের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান একেবারেই অসম্ভব।

তিনি আরো লিখেছেন ঃ

"ইয়াহূদীদের এ উক্তি: আল্লাহ্ তা'আলা এই দিন ফিরাউনকে ডুবিয়ে ধ্বংস করেছেন" খোদ তাওরাতের বর্ণিত মতামতেরই পরিপন্থী। কেননা তাওরাতের

---

[১] আমার মতে এটা আরবী শব্দ, প্রামাণ্য অভিধান গ্রন্থ লিসানুল আরবে ইবনুল মনজূরও এই মত সমর্থন করেছেন।

বর্ণনামতে ফিরাউনের সলিল সমাধি ঘটেছিল ২৯শে 'নিসন' আর রাসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের শুভাগমনের পর ইয়াহূদীদের 'মুক্তি উৎসবে' প্রথম সিয়াম ছিল মঙ্গলবার ২২শে আষাঢ় ৯৩৩ ইসকান্দারীয় বর্ষপঞ্জি মুতাবিক ১৭ই রমযান। অতএব, দেখা যাচ্ছে, উপরিউক্ত রিওয়ায়েতের কোন বিশুদ্ধ ভিত্তি নেই।

বস্তুত আল্-বেরুনীর এ সিদ্ধান্ত– গণিতশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অতুলনীয় মেধা ও বুদ্ধিমত্তার কথা শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেও বলতে হচ্ছে, কয়েকটি ভ্রান্ত ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

প্রথমত তিনি এটা ধরে নিয়েছেন, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও অন্যান্য সাহাবা কর্তৃক বর্ণিত আশুরার সিয়াম সম্পর্কিত আলোচনা হিজরতের প্রথম দিন হয়েছিল। কেননা হাদীসের শব্দ হচ্ছে নিম্নরূপ :

لما قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ـ

"যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন।"

কোন কোন হাদীসের শব্দ হচ্ছে এরূপ :

لما دخل النبى صلى الله عليه وسلم المدينة ـ

"যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় প্রবেশ করলেন।"

আর এটা সর্বস্বীকৃত সত্য, তাঁর হিজরত হয়েছিল রবিউল আওয়ালের প্রথমার্ধে।

বস্তুত হাদীসশাস্ত্রে আল্-বেরুনীর অগভীর জ্ঞান সাহাবাগণের বর্ণনাভঙ্গি ও বাচনশৈলীর সাথে পরিচয়ই তাঁকে এ বিভ্রান্তিতে ফেলেছে। অন্যথায় খুব সহজেই এটা তিনি উপলব্ধি করতে পারতেন, হাদীসের উপরিউক্ত শব্দ দ্বারা এ কথা কিছুতেই প্রমাণিত হয় না, মদীনায় রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শুভাগমনের দিনই এ আলোচনা হয়েছিল। এ ব্যাপারে হাদীস গ্রন্থসমূহ থেকে অজস্র দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে। যেমন–

আবূ দাউদে হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন এমন অবস্থায়, সেখানে উৎসব আনন্দের দু'টি দিন ছিল। তিনি তখন জানতে চাইলেন, এ দু'টি দিন কি? বলা হলো, জাহিলিয়তের যুগে এ দু'টি দিনে আমরা উৎসব আনন্দ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ এ দু'টি দিনের বিনিময়ে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আরো উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

উপরিউক্ত হাদীস থেকে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কি ঠিক হবে, তাদের উৎসব দিনেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম হিজরত করে মদীনায় পদার্পণ করেছিলেন? সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত দু'টি উৎসব দিবসেই কি তাঁর শুভাগমন হতে পারে?

আরো অনেক হাদীসেই এ ধরনের বর্ণনাভঙ্গি পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ এরূপ সিদ্ধান্ত নেন নি, মদীনায় পদার্পণের দিনটিতেই এসব ঘটনা ঘটেছিল।

উপরিউক্ত ঐতিহাসিক বিভ্রান্তির অপনোদন করতে গিয়ে আল্লামা ইবনে হাজার আস্‌কালানী (র.) লিখেছেন ঃ

"আশুরা সম্পর্কিত হাদীসগুলো সম্পর্কে তাঁর সংশয়ের মূল কারণ হচ্ছে এই, তিনি এটা ধরেই বসে আছেন, মদীনায় শুভ পদার্পণের দিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইয়াহূদীদেরকে আশুরার সিয়াম পালনরত অবস্থায় দেখেছিলেন এবং তাঁর মদীনায় পদার্পণ ঘটেছিল রবিউল আওয়ালের প্রথমার্ধে। মূলত তাঁর এ সংশয় অমূলক। কেননা হাদীসের প্রকৃত অর্থ হলো, ইয়াহূদীদের আশুরার সিয়াম পালন সম্পর্কে মদীনায় পদার্পণের পরই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম জানতে পেরেছিলেন, পূর্বে নয় এবং মদীনাতেই তিনি এ সম্পর্কে সর্বপ্রথম প্রশ্ন করেন। অতএব হাদীসের অর্থ দাঁড়াচ্ছে, যখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম মদীনায় তশরীফ আনলেন এবং আশুরা পর্যন্ত অবস্থান করলেন, তখন তিনি দেখলেন, ইয়াহূদীগণ আশুরার সিয়াম পালন করছে।"

[ফতহুল বারী, খণ্ড ৪, পৃ. ২১৪]

উপরিউক্ত হাদীসসমূহের এ ব্যাখ্যা মেনে নিলে আল্-বেরুনী পেশকৃত গাণিতিক তথ্যের সাথে কোন বিরোধই আর থাকে না।

দ্বিতীয়ত আল্-বেরুনীর ধারণামতে হাদীসে বর্ণিত আশুরার সিয়ামটি হচ্ছে ইয়াহূদীদের ধর্মীয় মাস 'তিসরি'র' দশম দিবসে পালিত প্রায়শ্চিত্ত রোযা। এ রোযাটি ইয়াহূদীদের কাছে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তাদের ধর্মীয় পরিভাষায় এ দিবসটির নাম হচ্ছে Yom Kippur। ইংরেজীতে যার মানে দাঁড়ায় Day of Atonement.

আল্-বেরুনীর এ ধারণাটিও অভ্রান্ত নয়। হাদীসে উল্লিখিত শব্দসমূহ ও তাওরাতের বর্ণনা এটাকে সমর্থন করে না। কেননা ইয়াহূদীদের বিরাট কোন ঐতিহাসিক পাপ ও জাতীয় অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ yom kippur-এর সিয়াম পালন করা হয়েছিল। এ দিনটি হচ্ছে ইয়াহূদীদের শোক দিবস। তাওরাতে প্রায়শ্চিত্ত সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

"এবং তোমাদের জন্য এটা এক স্থায়ী বিধান। তোমরা সপ্তম মাসের দশম দিনে আত্মাকে কঠোর শাস্তি দেবে এবং সেদিন কেউ কোন কাজ করতে পারবে না। কেননা প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে তোমাদেরকে পবিত্র করা হবে এবং তোমরা প্রভুর নিকট পবিত্র বলে গণ্য হবে।"

অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে ঃ

"অতঃপর এই সপ্তম মাসের দশম তারিখে তোমাদের পবিত্র সম্মেলন হওয়া উচিত। নিজ নিজ আত্মাকে তোমরা কঠোর যাতনা দেবে এবং অন্য কোন কাজে লিপ্ত হবে না।"

পক্ষান্তরে বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আশুরা দিনটি (যেদিন মুসলমানদেরকে রোযার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল) ছিল ইয়াহূদীদের অশেষ আনন্দের দিন। উৎসবের মাদকতায় মেতে ওঠার দিন।

ইমাম বুখারী রহমাতুল্লাহি আলায়হি হযরত আবূ মূসা আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

"খায়বারের ইয়াহূদীরা আশুরাকে ঈদের দিনের মতই মনে করত। তা দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, তোমরা এ দিনটিতে সিয়াম পালন কর।"

ইমাম মুসলিম রহমাতুল্লাহি আলায়হি রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"খায়বরের ইয়াহূদীরা আশুরায় রোযা রাখত এবং ঈদ উৎসবের মধ্য দিয়ে দিনটি আরো পালন করত। সেদিন তারা ইয়াহূদী ললনাদের মূল্যবান অলংকার ও পোশাকে ভূষিত করত। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন "এ দিনটিতে তোমরা সিয়াম পালন কর।"

হযরত উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে দু'টি সিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবেঃ রমযানুল মুবারকের সিয়াম ও সাজসজ্জা দিবসের (আশুরা দিবসের) সিয়াম।

এ সকল দিক বিবেচনা করে এ কথা বলা কিছুতেই যুক্তিসিদ্ধ নয়, আশুরার সিয়ামই হচ্ছে ইয়াহূদীদের বহুল আলোচিত সেই প্রায়শ্চিত্ত সিয়াম যা সপ্তম মাসের দশম দিনে পালন করা হয়ে থাকে। কেননা সে রকম হলে বোধগম্য কারণেই হাসি-আনন্দ ও উৎসব-উল্লাসের পরিবর্তে শোক-বিষাদের মাধ্যমেই আশুরার দিনটি পালিত হতো, অথচ হাদীস শরীফ থেকে জানা যায়, আশুরার দিনটি তাদের জন্য উৎসবের দিন ছিল।

আল্-বেরুনী ছাড়াও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক পণ্ডিত মনীষী এ বিভ্রান্তির শিকার হয়েছেন। আধুনিক লেখক, চিন্তাবিদ ও বিদগ্ধ জনদের একটা অংশ আল-বেরুনীর সিদ্ধান্তের প্রতি নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন।

প্রায়শ্চিত্ত সিয়ামের প্রতি ইংগিত করে Judaism Islam গ্রন্থে বলা হয়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম প্রথম দিকে এটাকে মুসলমানদের উপবাস দিবসরূপে ঘোষণা করেছিলেন।

"এটা সেই দিন যেদিন বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ্ পাক শত্রুর কবল থেকে নাজাত দিয়েছেন।" আশুরা সম্পর্কে ইয়াহূদীদের উপরিউক্ত মন্তব্য সকল বিভ্রান্তি অপনোদনের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হয়। কেননা এটা খুবই সুস্পষ্ট, শত্রু বলতে এখানে ফিরাউন ও তার সাথী-সঙ্গীদেরই বোঝানো হয়েছে। নীলনদে ফিরাউনের সদলবলে সলিল সমাধি লাভের দিনটিকে তাওরাতের বিভিন্ন স্থানে 'আবীব' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অবশ্য পরে এর পরিবর্তে 'নাসীন' নামটি ব্যবহার শুরু হয়। 'আবীব' (Abib) শব্দের ব্যাখ্যায় বুস্তানী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে ঃ

"এটা একটা হিব্রু শব্দ, যার অর্থ হলো সবুজ। এটা হিব্রু বর্ষের প্রথম মাসের নাম এবং স্বয়ং মূসা আলায়হিস্ সালামই এ নাম রেখেছিলেন।

ইসরাঈলীদেরকে বাবেলে নির্বাসিত করার পর আবীব শব্দের স্থলে নসীন শব্দটির প্রচলন করা হয়। এর অর্থ হলো ফুলের মাস। উক্ত বিশ্বকোষে এ কথাও বলা হয়েছে, আবীব মাসটি হলো ইয়াহুদী বর্ষপঞ্জির সপ্তম মাস।

উপরোল্লিখিত তথ্যাদির ভিত্তিতে ও ইহুদীদের ইতিহাস ও জাতীয় চরিত্র পর্যালোচনার পর অত্যন্ত দ্বিধাহীন চিত্তে আমরা এ সিদ্ধান্তে পৌছতে পারি, হাদীসে বর্ণিত আশুরা ও ইহূদীদের আশুরা (যা ইহূদী বর্ষপঞ্জির আবীব বা নাসীন মাসের মধ্যভাগে পড়ে) প্রকৃতপক্ষেই অভিন্ন দিন এবং ইহূদীদের কাছে এ দিনটি উৎসবমুখর দিন হিসেবেই পরিগণিত ছিল[১] এবং এ দিনই ফিরাউনের সলিল সমাধি ঘটেছিল।

ইহূদী ধর্ম গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে, "মূসা (আ.) সকলকে বললেন, সে দিনটির কথা স্মরণ রেখো, যেদিন তোমরা গোলামির জীবন থেকে মুক্ত হয়ে মিসর থেকে বের হয়েছ। কেননা প্রভু তোমাদেরকে আপন শক্তি বলে সেখান থেকে বের করেছেন। সেদিন যেন খামির করা রুটি না খাওয়া হয়। তোমরা আবীব মাসের আজকের দিনে বের হয়েছ।"

যা-ই হোক, এটা অবধারিত, আমাদের আলোচিত আশুরার দিনটি হিজরতের দ্বিতীয় বর্ষের আরবী মাস মুহররমের দশম তারিখ মুতাবিকই ছিল। পরে রমযানের মাধ্যমে উক্ত আশুরার রোযা রহিত হয়ে যায়।

তদুপরি আরবী বর্ষ ও সৌর বর্ষের মাঝে সমন্বয় নিরূপণ নিছক অনুমাননির্ভর বিষয় এবং এজন্য আরব জাহিলিয়াতে প্রচলিত 'নাসী' প্রথাটিই মূলত দায়ী।

"নাসী" (نَسِيٌّ) অর্থ গোষ্ঠী বা দলের স্বার্থ রক্ষার জন্য নিজেদের মর্জি মাফিক কোন মাস এগিয়ে নিয়ে আসা কিংবা পিছিয়ে দেয়া। ইসলাম-পূর্ব আরবদের মধ্যে এ প্রথাটির খুব প্রচলন ছিল, এমন কি ইসলামের প্রাথমিক যুগেও এ ব্যাধি আরবদের মধ্যে ছিল। আল-কুরআনে এই বিকৃত মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও কঠোর ধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ـ

"মাসের মধ্যে নড়চড় করা চরম পর্যায়ের কুফরি।" [সূরা তাওবা ঃ ৩৭]

---

১. অনেকের এ কথা মনে হতে পারে, রোযা ও উৎসব-আনন্দের মাঝে কি সম্পর্ক। কিন্তু ইহূদী ও খ্রিস্টানদের রোযাকে মুসলমানদের সিয়ামের সাথে তুলনা করে দেখা উচিত নয়। ইহূদী বিশ্বকোষে স্পষ্টই এ কথা আছে, এটা রোযা ও উৎসবের দিন।

বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"নিশ্চয় সময় তার আকাশ ও যমীন সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ফিরে গেছে। রাসূলুল্লাহ্র এ ফরমান ছিল ওহীভিত্তিক। কেননা আরবী বর্ষপঞ্জিতে এত মনগড়া রদবদল হয়েছিল এর ওপর আর কোনক্রমেই আস্থা স্থাপন করা চলে না এবং গণিত শাস্ত্রের ওপর ভরসা করে তাকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াও সম্ভব নয়। অতএব এমন অনির্ভরযোগ্য বর্ষপঞ্জির ভিত্তিতে, যা ইসলাম পূর্ব ও ইসলামের উভয়কালেই সমান অনির্ভরযোগ্য ছিল হাদীসশাস্ত্রের স্বীকৃত মূলনীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ ও প্রমাণিত কোন হাদীসকে অস্বীকার করার কোনই যৌক্তিকতা আমরা খুঁজে পাই না।

তাছাড়া এও হতে পারে, মদীনার ইহূদীরা আশুরার সিয়ামের ব্যাপারে অন্যান্য অঞ্চলের ইহূদীদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। হয়তো তাদের ওপর স্থানীয় আরবদের প্রভাব পড়েছিল। কেননা হিজাযের বিভিন্ন গোত্র আশুরাকে একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিন হিসেবে যথেষ্ট মর্যাদার সাথে পালন করত এবং অনেকেই সিয়াম পালন করত।

হযরত আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহা কর্তৃক সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, কুরায়শগণ আইয়ামে জাহিলিয়াতে আশুরার সিয়াম পালন করত এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামও সেদিন সিয়াম পালন করতেন।

Jewish Encyclopaedia থেকেও এ সম্ভাবনার হদিস মেলে। সেখানে সুস্পষ্টভাবেই একথা বলা হয়েছে, ইহূদীদের মধ্যে কিছু কিছু স্থানীয় ও আঞ্চলিক রোযার প্রচলনও ছিল এবং এগুলোর সম্পর্ক ছিল সাধারণত স্থানীয় কোন ঐতিহাসিক ঘটনা-দুর্ঘটনার সাথে। ফলে যে সিয়াম এক অঞ্চলে খুব গুরুত্বের সাথে পালিত হতো, অন্য অঞ্চলে তার নামও হয়ত ছিল অপরিচিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে এটা মনে করা অসঙ্গত হবে না, মুহররমের দশ তারিখের সিয়াম আরব ইহূদীদের মধ্যেই শুধু প্রচলিত ছিল। সম্ভবত এ কারণেই ইহূদীদের ধর্ম গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রামাণ্য সূত্র এ ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ। অধিকাংশ ঐতিহাসিক এটাকে ইহূদীদের সুপ্রসিদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত রোযা বলে অভিহিত করেছেন; যা দেশ, কাল, অঞ্চল ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে ইহূদীদের একটা সার্বজনীন ধর্মীয় ব্রত

ছিল। আশুরার সিয়ামকে যারা সেই সার্বজনীন প্রায়শ্চিত্ত রোযা বলে ধরে নিয়েছেন তারাই গণিতশাস্ত্রের মারপ্যাঁচে বিভ্রান্ত হয়ে আশুরা সম্পর্কিত সহীহ্ হাদীসসমূহ অস্বীকার করে বসেছেন। কিন্তু এই তাড়াহুড়োর সিদ্ধান্তটি কত দূর সংগত হয়েছে তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। আমরা মনে করি, এটা ইহূদীদের স্বভাব-প্রকৃতি ও ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য, বিশেষত ইহূদী ধর্মের ওপর আঞ্চলিক ও স্থানীয় প্রভাব সম্পর্কে অজ্ঞতার স্বাভাবিক কুফল। আরবীয় ইহূদীদের সম্পর্কে বিভিন্ন প্রামাণ্য সূত্রগুলোর নীরবতাও এ বিভ্রান্তির অন্যতম প্রধান কারণ।

আরবীয় ইহূদীরা দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী ধরে বংশপরম্পরায় একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে হিজায ভূমিতে বসবাস করে আসছিল এবং স্বতন্ত্র ধর্মীয় বিশ্বাস, স্বভাব ও নৈতিক মূল্যবোধের অধিকারী ছিল। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভাষার মত তারাও আপন ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রতিবেশী জাতির বিশ্বাস ও ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়েছিল।

সিয়ামের বিধানবাহী আয়াতসমূহ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, উদর পূজা ও স্থূল পাশব বৃত্তির গোলামিতে নির্জীব ও মৃতপ্রায় আত্মাকে পুনরায় সজীব ও সবল করে তোলা এবং কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে ইনসানকে খিলাফতের সুমহান দায়িত্ব ভার গ্রহণের যোগ্য করে গড়ে তোলাই হচ্ছে সিয়ামের বিধান নাযিল করার উদ্দেশ্য। সিয়াম মানুষকে শিক্ষা দেয় ধৈর্য, সহনশীলতা, সহানুভূতি, সমবেদনা, ন্যায় বিচার ও ভারসাম্যপূর্ণতার। খিলাফতের গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য এ সকল মহৎ গুণ অর্জন করা খুবই জরুরী। সেই সাথে সিয়াম হচ্ছে এমন সব ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের উৎস যা মানুষের সীমিত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বহু ঊর্ধ্বে।

তবে এখানে লক্ষণীয়, সিয়ামের বিধান ঠিক তখনই নাযিল করা হয়েছে, যখন সারা দুনিয়ার শির্ক ও তাগুতী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মুষ্টিমেয় সহায়-সম্বলহীন মুসলমানের মাথার ওপর থেকে বিপদের মেঘ কেটে গিয়ে অর্থনৈতিক নিপীড়ন ও চরম দারিদ্র্যের অমানিশার পর সুখের দিনের প্রভাত কিরণ মদীনার পূর্ব আকাশে দেখা দিয়েছে এবং মদীনায় এসে মুসলমানগণ একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার সুযোগ লাভ করেছেন। হ্যাঁ, ঠিক তখনই নাযিল হয়েছে সিয়াম সাধনার বৈপ্লবিক বিধান। এর হিকমত সম্ভবত এই, দুর্যোগকালীন এ

বিধান নাযিল হলে অনেকেই হয়ত এ কথা মনে করার সুযোগ পেত, সিয়াম হচ্ছে অর্থনৈতিক দৈন্য ও অসচ্ছলতার শিকার ফকীর, মিসকীন, অসহায়-অক্ষম ও মজলুমদের ইবাদত, যমীন ও উদ্যানের মালিক ভাগ্যবান সচ্ছলদের ইবাদত নয়।

অন্যদিকে সিয়ামের বিধান তখনই শুধু নাযিল করা হয়েছে যখন ঈমান, আকীদা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ পরিপূর্ণ মজবুতি ও পরিপক্বতা অর্জন করে নিয়েছিলেন এবং সালাতের সাথে তাদের সুগভীর ও প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপিত হয়ে গিয়েছিল। ব্যতিক্রমহীনভাবে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহ্‌র যে কোন নির্দেশের সামনে দ্বিধাহীনচিত্তে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মসমর্পণ করার জন্য ছিলেন সদা প্রস্তুত, বরং মনে হতো প্রতিটি মুহূর্তেই যেন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নতুন কোন বিধান লাভের জন্য তারা অধীর অপেক্ষমাণ।

এ সূক্ষ্ম বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

" যেহেতু মানুষকে চিরাচরিত স্বভাব ও প্রকৃতি থেকে ফিরিয়ে রাখাই হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ব্যাপার, সেহেতু সিয়ামের বিধান নাযিল করার ব্যাপারে মোটেও তাড়াহুড়ো করা হয়নি, এমন কি হিজরতের পরেও সাথে সাথে সিয়ামের নির্দেশ দেয়া হয়নি, বরং মদীনার মুক্ত বাতাসে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলার পরও মুসলমানদেরকে (মানসিক প্রস্তুতির জন্য) পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়েছে। যখন একথা সুপ্রমাণিত হয়ে গেলো, মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের শিকড় অত্যন্ত মজবুত হয়ে বসে গেছে, রগে-রেশায় মিশে গেছে তাওহীদের আবেদন ও সালাতের মর্মবাণী, আল-কুরআনের নতুন যে কোন নির্দেশের জন্যই এখন তাঁরা সদা উদ্‌গ্রীব, ঠিক তখনই হিজরতের দ্বিতীয় বছরে নাযিল হলো সিয়ামের বিধান এবং রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম নয়টি রমযান সিয়াম পালন করে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন।

সিয়ামের বিধানবাহী আল-কুরআনের আয়াতটি হচ্ছে এই ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۔ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ

مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۔ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۔ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ۔ وَاَنْ تَصُوْمُوْا
خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ
الْقُرْاٰنِ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۔ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ
الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ
۔ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর ফরয করা হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তোমরা মুত্তাকী হতে পারবে। অল্প কয়দিনে মাত্র। অতএব, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অসুস্থ হয় (এবং সিয়াম পালনে অপারগ হয়) কিংবা সফরে থাকে তবে সে অন্য সময় গণনা করে সিয়াম আদায় করে নেবে। আর যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয়, তারা ফিদয়াহ অর্থাৎ একজন মিসকীনের খোরাক দান করবে। তবে সিয়াম পালন করাই উত্তম, যদি তোমরা সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে খবর রাখ। রমযান মাস, যে মাসে নাযিল হলো আল-কুরআন, মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ। তাতে রয়েছে প্রকাশ্য প্রমাণসমূহ যা হিদায়াত ও মীমাংসাকারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এই মাসে বর্তমান থাকে সে যেন অবশ্যই সিয়াম পালন করে। আর যে ব্যক্তি অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয়, তবে সে অন্য সময় গণনা করে সিয়াম আদায় করে নেবে। আল্লাহ্ তোমাদের ব্যাপারে সহজ পথ অবলম্বন করতে চান এবং তোমাদের সাথে কঠোরতা করতে চান না। আর যেন তোমরা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ করতে পার। আর যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে পার; কেননা তিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন। আর যেন তোমরা আল্লাহ্‌র শোকর আদায় করতে পার।" [সূরা ঃ বাকারা ঃ ১৮৩-১৮৫]

সিয়ামের বিধানবাহী আল-কুরআনের এই আয়াতসমূহ প্রাণহীন সকল মানবীয় বিধান থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র যা শাসক ও শাসিতের মাঝে বিদ্যমান রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ভিত্তিতে বলবৎ করা হয়। এই আয়াতসমূহ

একযোগে ঈমান ও বিশ্বাস, আকল ও বিবেক এবং হৃদয় ও অনুভূতিকে সজীব ও জাগ্রত করার চেষ্টা করেছে। তার আবেদন হচ্ছে মানুষের বিশ্বাসের কাছে, বিবেক ও হৃদয়ের কাছে। যে কোন উপায়ে আইন কার্যকর করার পরিবর্তে পরিবেশ ও ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ওপরই সে গুরুত্ব আরোপ করেছে সর্বপ্রথম যেন মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অন্তরে আল্লাহ্‌র এ বিধানটি মেনে নিতে উন্মুখ-উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। দাওয়াত ও বিধান প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মানুষের জটিল ও সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে অত্যন্ত হিকমতপূর্ণ উপায়ে আল-কুরআন অগ্রসর হয়েছে। বস্তুত এটা আল-কুরআনের এমন এক জীবন্ত মু'জিযা যা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

تَنْزِيْلٌ مِّنْ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ -

"সত্যিই এ কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যিনি অত্যন্ত প্রজ্ঞাবান ও প্রশংসার অধিকারী।" [সূরা হামীম সিজদা : ৪২]

সিয়ামের বিধান যাদের ওপর অবতীর্ণ হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা প্রথমেই তাদেরকে সম্বোধন করেছেন এভাবে, "হে ঈমানদারগণ! হে বিশ্বাসিগণ! এর মাধ্যমে অতি সূক্ষ্ম উপায়ে মুসলমানদের উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ সকল বিধান অম্লান বদনে মেনে নেয়ার প্রতি যত কঠিন ও কষ্টসাধ্যই হোক সে বিধান। কেননা এটা হচ্ছে তার হৃদয়ের নরম মাটিতে অংকুরিত ও পল্লবিত ঈমানের আবেদন–বিশ্বাসের দাবি। আমি যখন আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করব, তাঁর প্রভুত্ব ও সার্বভৌমত্ব মেনে নেব, সেই সাথে স্বীকার করে নেব তাঁর একক আনুগত্য ও নিরঙ্কুশ 'আবদিয়াত, স্বাভাবিক কারণেই তখন আমার জন্য অপরিহার্য কর্তব্য হবে তাঁর যে কোন বিধান, যে কোন নির্দেশ এবং যে কোন দাবি অবনত মস্তকে মেনে নেয়া। কেননা :

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا -

"ঈমানদারদের তো কথা এই, যখন তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হবে তখন তারা বলবে, আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম এবং এরাই তো সফলকাম হবে। [সূরা নূর : ৫১]

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ -

"কোন ঈমানদার নর-নারীর পক্ষে এটা সম্ভব নয়, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের কোন কাজের নির্দেশ প্রদানের পর সেই কাজ (নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী করার) তাদের কোন এখতিয়ার থাকবে (বরং অবনত মস্তকে তা হুবহু পালন করাই ওয়াজিব)।"

[সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৬]

ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান যা মানব জীবনের সকল দিকের জন্যই ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ ও মঙ্গলের নিশ্চয়তা বিধান করে। ইসলামী শরীয়ত হচ্ছে এক 'আবেহায়াত' যা মানুষকে সন্ধান দেয় কল্পনাতীত এক অনন্ত জীবনের অফুরন্ত নিয়ামতে পরিপূর্ণ, হুর-গিলমানের মধুর কলহাস্যে সদা মুখরিত এক চিরসবুজ উদ্যানের, যা কেউ কোনদিন দেখেনি, শোনেনি, এমন কি কল্পনাও করেনি। অতএব,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۔

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের ডাকে সাড়া দিও যখন রসূল তোমাদেরকে তোমাদের জীবন সঞ্চারক বিষয়ের দিকে আহ্বান করেন।"

[সূরা আল-আনফাল ঃ ২৪]

এরপর আল্লাহ্ ইরশাদ করছেন, সিয়ামের এ বিধান মানব জাতির ধর্মের ইতিহাসে নতুন ও আকস্মিক কোন বিধান নয়। পূর্ববর্তী সকল জাতি ও ধর্মেই রোযার বিধান অবতীর্ণ হয়েছিল। এভাবে সিয়ামের বিধানকে মানুষের জন্য আল্লাহ্ অপেক্ষাকৃত সহজ করে দিয়েছেন। কেননা নিঃসঙ্গতার অনুভূতি মানুষকে যেমন ঘাবড়ে দেয় তেমনি মানুষ যখন এ কথা জানতে পারে, যে নির্দেশ তার ওপর অবতীর্ণ হয়েছে কষ্টসাধ্য হলেও সেটা নতুন ও আকস্মিক কিছু নয়, বরং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ওপরও এ নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তারা তা পালনও করেছে তখন কষ্টসাধ্য কাজও তার জন্য কিঞ্চিৎ আসান হয়ে পড়ে এবং তার মনোবল ফিরে আসে। শুধু তাই নয়, এক ধরনের প্রতিযোগিতার মনোভাবও সৃষ্টি হয় তার মধ্যে।

এরপর ইরশাদ হচ্ছে, এটা উদ্দেশ্যহীন, অনর্থক কিংবা বেগার কোন খাটুনি নয়, বরং এ হচ্ছে মুজাহাদার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ ও নৈতিক শুচিতা অর্জনের এক কার্যকর শোধনাগার বা প্রশিক্ষণ সেন্টার। সিয়াম সাধনা মানুষকে

এতই শুচিশুভ্র ও পূত-পবিত্র করে দেয় যে, সে তখন পাশব বৃত্তি ও ষড় রিপুর ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে সক্ষম হয়। জৈবিক ও পাশবিক ইচ্ছা তার ওপর প্রভুত্ব করে না, বরং সেই তাকে শাসন করে। আল্লাহ্‌র একটি মাত্র নির্দেশের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে যে মানুষ দেহ ও মনের সকল ইচ্ছা ও চাহিদা বিসর্জন দিতে পারে হাসি মুখে, সে মানুষ আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ ও অবৈধ জিনিসসমূহ থেকে বিরত থাকবে না এটা কিছুতেই কল্পনা করা যেতে পারে না। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও ক্ষুৎপিপাসার মুখে শীতল, সুস্বাদু, সুমিষ্ট পানীয় ও উপাদেয় আহার্য দ্রব্য যে উপেক্ষা করতে পারে, সে কি কখনও হারাম ও অপবিত্র জিনিসের দিকে চোখ উঠিয়ে দেখতে পারে? এটাই হচ্ছে لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ-এর মর্ম।

সেই সাথে এও ইরশাদ হয়েছে, মাসের এই তিরিশটি দিন এত দীর্ঘ মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? এ তো হাতে গোণা মাত্র ক'টি দিন যা দেখতে দেখতেই শেষ হয়ে যায়। যেদিন গত হয় সেদিন কি আর কোনদিন ফিরে আসে? এ ছাড়া সারা বছরের সুখ-বিলাস ও ভোগ-উপভোগের তুলনায় এই একটি মাস কিইবা এমন বেশী। সেখানেও তো শুধু দিনে সিয়াম পালনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আবার অসুস্থ, মুসাফির ও সিয়াম পালনে অক্ষম বার্ধক্যপীড়িত ব্যক্তিদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

অতঃপর এই পবিত্র মাসের ফযীলত ও মর্যাদা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছে, সিয়াম সাধনার এই মাহে রমযানেই মানব জাতির জন্য সুখ-শান্তি, কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ এক নব জীবনের বার্তা বহন করে নাযিল হয়েছে পাক কালাম আল-কুরআন। একজন মুসলমানের জন্য এর চেয়ে সৌভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে, এই মুবারক মাসে সালাত ও সিয়াম সাধনার মাধ্যমে সে লাভ করবে নতুন ঈমান, নতুন শক্তি ও নতুন প্রাণ। এ সিয়াম হচ্ছে প্রাণ শক্তিতে ভরপুর এবং কল্যাণ ও বরকতে পরিপূর্ণ এক ধরনের আধ্যাত্মিক খোরাক। এ সিয়াম মানুষের জন্য বিপদ, কষ্ট কিংবা বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সকল উপাদানবিমুক্ত এক তরবিয়তী বিধান যা মানুষকে পৌঁছে দেয় হিদায়াত ও সৌভাগ্যের শীর্ষ সোপানে।

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ - وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ -

"আল্লাহ্ তোমাদের জন্য কঠোরতা পছন্দ করেন না, বরং আসানি পছন্দ করেন। আর এও পছন্দ করেন, তোমরা গণনা পূর্ণ করে নেবে এবং আল্লাহ্র বড়ত্ব বর্ণনা করবে। কেননা তিনি তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন। হয়ত তোমরা শোকর গুযার হিসেবে প্রমাণিত হতে পারবে।"

সিয়ামের যে রূপরেখা ইসলাম পেশ করেছে তা আইন ও বিধান এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উভয় দিক থেকেই পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাঙ্গীণ ব্যবস্থা। মানুষের কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই রহীম, রহমান ও মহাপ্রজ্ঞাবান প্রতিপালক তা নাযিল করেছেন। বস্তুত আল্লাহ্ পাকের অনন্ত হিকমত ও প্রজ্ঞারই পূর্ণ প্রতিফলন ঘটেছে এ তরবিয়াত বিধানে।

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

"তিনিই কি জানবেন না যিনি সৃষ্টি করেছেন, অথচ তিনিই একমাত্র সূক্ষ্মদর্শী, প্রজ্ঞার অধিকারী?"

রমাযানুল মুবারকের পূর্ণ মাসকেই সিয়ামের জন নির্দিষ্ট করা হয়েছে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত হলো সিয়ামের মেয়াদ। রাতে অন্যান্য সময়ের মতই রয়েছে পানাহারসহ অন্যান্য বৈধ বিষয়ের পূর্ণ অনুমতি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের যামানা থেকে আজ পর্যন্ত গোটা আলমে ইসলামীতে সর্ববাদীসম্মতভাবে উপরিউক্ত নিয়মেই সিয়াম পালিত হয়ে আসছে। হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহলভী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন, "সিয়ামের সময় হচ্ছে সুবহে সাদিক থেকে শুরু করে সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। কেননা আরবদের কাছে দিনের হিসেব এই নিয়মেই চলে আসছে। আশুরার সিয়ামও তারা এই নিয়মেই পালন করে আসছিল। তদ্রূপ চাঁদ দেখার মাধ্যমে মাসের শুরু ও শেষ নির্ধারিত হয়ে থাকে। কেননা আরবদের হিসাব চন্দ্রভিত্তিক, সৌরভিত্তিক নয়।" [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ খ. ২ পৃ. ৩৭]

রমাযানের সাথে সিয়ামের সম্পর্ক

এখানে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, সিয়ামকে রমাযানুল মুবারকে কেন ফরয করা হলো? কি এর হিকমত ও তাৎপর্য?

বস্তুত মহাপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ্ পাক কেন সিয়ামকে রমাযান মাসে ফরয করেছেন? এবং কি এর হিকমত ও রহস্য তা এই মানবীয় ক্ষুদ্রতা ও স্থূলতার

মধ্যে অবস্থান করে অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তবে এতটুকু বলা যায়, রমাযান মাসেই আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। গোমরাহীর ঘন অন্ধকারে নিমজ্জিত 'মানবতার পূর্ব আকাশে উদ্ভাসিত হয়েছে সুবহে সাদিকের সোনালি আলো। তাই এটা খুবই যুক্তিযুক্ত ছিল, সিয়ামের প্রারম্ভকে যেরূপ সুবহে সাদিকের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়েছে, তদ্রূপ ত্রিশটি সিয়ামের জন্যও মানবতার সুবহে সাদিকের মাস মাহে রমাযানকে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। তদুপরি আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত এবং রূহানিয়াত ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও মাহে রমাযান অন্যান্য মাসের তুলনায় অধিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তাই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, সিয়াম সাধনার জন্য এ মুবারক মাসটিই ছিল সর্বাধিক উপযুক্ত।

সিয়ামের সাথে কুরআনের রয়েছে এক সুগভীর আত্মিক ও প্রেমময় সম্পর্ক। এজন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমাযানুল মুবারকে কুরআন তিলাওয়াতে অত্যধিক মনোযোগী হয়ে পড়তেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম সকলের চেয়ে বেশী দানশীল ও বদান্য ছিলেন। কিন্তু রমাযানুল মুবারকে জিবরাঈল (আ.) যখন তাঁর সাথে মিলিত হতেন, তখন তাঁর দানীলতা ও বদান্যতার পরিমাণ আরো বেড়ে যেত। প্রতিটি রমাযান মুবারকে জিবরাঈল (আ.) রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের সাথে মিলিত হতেন এবং সমগ্র কুরআন 'দওর' করতেন (অর্থাৎ একে অপরকে শোনাতেন)। দান ও বদান্যতা এবং নেক ও ভাল কাজের দিকে তখন তাঁকে কল্যাণবাহী বাতাসের চেয়েও দ্রুত ও অগ্রবর্তী মনে হতো।"

[বুখারী, মুসলিম]

হযরত মুজাদ্দিদে আলফ-ই-ছানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি তাঁর এক চিঠিতে লিখেছেনঃ

"কুরআন পাকের সাথে এই পবিত্র মাসটির এক বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে এবং এই সম্পর্কের কারণেই আল-কুরআন মাহে রমাযানে নাযিল হয়েছে। সকল প্রকার বরকত ও কল্যাণে এ মাস পরিপূর্ণ। সারা বছর মানুষ যত কল্যাণ ও বরকত লাভ করে এই একটি মাসের বরকত ও কল্যাণের তুলনায় তা ততটুকুই ক্ষুদ্র, যতটুকু ক্ষুদ্র বিশাল সমুদ্রের মুকাবিলায় এক বিন্দু পানি। এ মাসে আত্মিক প্রশান্তি লাভ সারা বছর ধরে অখণ্ড আত্মিক প্রশান্তি লাভেরই ইঙ্গিতবহ এবং এ মাসে এর বিপরীত অবস্থা সারা বছরের জন্যই- অশুভ। বড়ই মুবারক ও

সৌভাগ্যবান তারা, যাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে এ মাস বিদায় নিয়েছে এবং বড়ই দুর্ভাগা তারা, যারা এ মাসটিকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়েছে। এ মাসের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়েছে।"

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "রমাযানুল মুবারকে জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয়, জাহান্নামের সকল দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং শয়তানকে শৃংখলিত অবস্থায় বন্দী করে রাখা হয়।" এ বিষয়ে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত হয়েছে।

ইবাদত ও পুণ্যের বিশ্বমৌসুম

বস্তুত রমাযানুল মুবারক হচ্ছে ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকির, পবিত্রতা ও নৈকট্য লাভের এক বিশ্বমৌসুম। আত্মিক উৎকর্ষ ও পরকালীন কল্যাণ লাভের এক ঐশী উৎসব। পূর্ব-পশ্চিম তথা দুনিয়ার সকল অঞ্চলের সকল শ্রেণীর সকল মুসলমান সমভাবে এ উৎসবে শরীক। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পণ্ডিত-মূর্খ, শাসক-প্রজা ও ধনী-গরীব সকলেই ইহ ও পরকালীন কল্যাণ অর্জনের এ প্রতিযোগিতায় সমান উৎসাহী।

ইসলামী দুনিয়ার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত একই সময়ে অভিন্ন নিয়মে পালিত হচ্ছে রমাযানুল মুবারক। ধনীর প্রাসাদ ও গরীবের পর্ণ কুটির সর্বত্রই তার অফুরন্ত কল্যাণ ও বরকতের অবাধ গতি। এখানে কেউ নিজস্ব মত খাটাতে ব্যস্ত নয়। ফলে সিয়ামের দিন, সময়, রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারণে নেই কোন অরাজকতা ও বিশৃংখলা। প্রত্যেক চক্ষুষ্মান ব্যক্তি ইসলামী জাহানের যে কোন অঞ্চলেই রমাযানুল মুবারকের কল্যাণবর্ষী ও জ্যোতির্ময় সে দৃশ্য অবলোকন করতে পারে। মনে হয় যেন গোটা ইসলামী উম্মাহ্ শান্তি ও কল্যাণের, নূরানিয়াত ও স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময়তার এক বিস্তৃত শামিয়ানার নীচে ঠাঁই নিয়েছে, এমন কি ঈমানী দুর্বলতার কারণে সিয়ামের ব্যাপারে যারা অনীহ ও অলস, তারাও মুসলিম উম্মাহ্ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার ভয়ে রোযা রাখতে বাধ্য হয় কিংবা রোযা না রাখলেও প্রকাশ্য পানাহার চালিয়ে যেতে ইতস্তত ও লজ্জিত বোধ করে। পর্দা টানিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে পানাহার করে এবং রোযা না রাখার কথা প্রকাশ করতে কুণ্ঠাবোধ করে। অবশ্য সেই সব ধর্মদ্রোহী, মৃতাত্মা ফাসিকদের কথা ভিন্ন, লজ্জার অনুভূতিটুকুও যাদের বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

রমাযানুল মুবারকের এই বিশ্বব্যাপিতার ফলে এমন এক অনুকূল ও স্নিগ্ধ পরিবেশ সৃষ্টি হয়, হৃদয়ের শক্ত যমীন হয়ে ওঠে কোমল ও উর্বর। সিয়াম সাধনার মাধ্যমে আপন আপন প্রতিপালকের ইবাদত ও আনুগত্য প্রকাশ এবং মানুষের প্রতি হামদরদী ও সমবেদনার কোমল অনুভূতি হয়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত।

মানব সমাজে সিয়ামের প্রভাব

সিয়াম সাধনার এ সৌন্দর্য ও মহিমাপূর্ণ রূপ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর অন্তর্চক্ষু দ্বারা যথার্থই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"রমাযানুল মুবারকের শুভাগমনের সাথে সাথে খুলে দেয়া হয় জান্নাতের সকল দরজা।" উপরিউক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসংগে তিনি লিখেছেন ঃ

"সিয়াম যেহেতু একটি সার্বজনীন ইবাদত সেহেতু রুসুম ও বিদ'আতের সকল আবিলতা থেকে তা মুক্ত। জামাত ও শ্রেণী যখন নিষ্ঠার সাথে সিয়াম সাধনায় ব্রতী হয় তখন তাদের জন্য শয়তানকে বন্দী করে রাখা হয়। জান্নাতের সকল দরজা খুলে দেয়া হয় এবং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়।"

অন্যত্র তিনি লিখেছেন ঃ

"মুসলমানদের সকল জামা'আত ও শ্রেণী যেহেতু একই সাথে একই নিয়মে সিয়াম পালন করে, সেহেতু এ কঠিন ইবাদতও তাদের জন্য সহজসাধ্য হয়ে যায় এবং এই ঐক্যবদ্ধ অবস্থার কারণে সকলেই ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করে।

"তদ্রূপ এই ঐক্যবদ্ধ ইবাদত বিশিষ্ট ও সাধারণ সকলের জন্যেই কল্যাণ ও বরকত বর্ষণ করে। আহলুল্লাহ্ তথা আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের ওপর যে নূর ও জ্যোতি বর্ষিত হয় এবং আল্লাহ্‌র সে অসংখ্য নিয়ামত তারা লাভ করেন, সাধারণ লোকেরাও তার অংশবিশেষ পেয়ে থাকে। কেননা সকল মুসলমানের জন্যই তারা দোআ করে থাকেন।"

ফাযায়েলের গুরুত্ব

মানুষের জীবন হচ্ছে প্রবৃত্তি ও বিবেকের স্থায়ী দ্বন্দ্বের এক উত্তপ্ত রণক্ষেত্র। কিন্তু এ ধারণা ঠিক নয়, বিবেক ও প্রবৃত্তির এ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্তিই সর্বদা বিবেকের

ওপর জয় লাভ করবে। এমন সিদ্ধান্ত প্রকৃতপক্ষে মানব চরিত্রের ওপর অশ্রদ্ধা ও অবিচারেরই নামান্তর। মানুষের স্বভাব ও ফিতরত সম্পর্কে অজ্ঞতাই এর কারণ।

নিত্য-নতুন উদ্যমে, অকুতোভয়ে, কঠিন জীবনযুদ্ধে মানুষের ঝাঁপিয়ে পড়ার পেছনে লাভ ও মুনাফার বিশ্বাসই ক্রিয়াশীল। লাভ ও মুনাফার এ বিশ্বাসই হাড় কাঁপানো প্রচণ্ড শীতের মৌসুমে সুখ-শয্যার উষ্ণতা বিসর্জন দিতে বাধ্য করে গরীব কৃষককে। আগুন- ঝরা রোদে পুড়ে কিংবা মুষলধারে বৃষ্টিতে ভিজে শক্ত হাতে লাঙ্গল ধরার শক্তি ও সাহস জোগায় তাকে। এ বিশ্বাসের বলেই আরাম-আয়েশ বিসর্জন দিয়ে প্রিয়জনের স্নেহ-বন্ধন উপেক্ষা করে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায় সাত সাগরের সওদাগর। ভয়ভীতি কিংবা বাধার বিন্ধ্যাচল কোন কিছুই তখন দাঁড়াতে পারে না তার পথ রোধ করে। একান্ত অবহেলা ভরে সকল বাধা ডিঙ্গিয়ে এগিয়ে চলে সে তার মঞ্জিলে মকসুদের পানে। কেননা লাভ ও মুনাফার বিশ্বাস তাকে বিভোর করে রাখে সোনালী দিনের সুখস্বপ্নে। এ বিশ্বাসই একজন সৈনিকের অন্তরে সৃষ্টি করে মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে তোপ-তরবারির মুখে গিয়ে দাঁড়ানোর উন্মাদনা। প্রিয়জনের কাজল চোখের সজল চাহনি, শিশু সন্তানের প্রাণ ভোলানো নিষ্পাপ হাসি কিংবা তার কচি হাতের হাতছানি কোন কিছুই তখন ফেরাতে পারে না তাকে মৃত্যুর হিমশীতল বিভীষিকা থেকে। লাভ ও মুনাফার এ বিন্দুকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হচ্ছে মানব জীবন।

কিন্তু এটা হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী, পার্থিব মুনাফা যা মৃত্যুর সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, অথচ তা অর্জন করার জন্য দিতে হয় জীবনের শ্রেষ্ঠতম মুহূর্তগুলো। প্রয়োজন হয় অক্লান্ত পরিশ্রম ও কঠোর সাধনার।

আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী-রসূলগণ মানব জাতিকে আরেকটি মুনাফার সন্ধান দিয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও দুনিয়া ও আখিরাতে নেক আমলের উত্তম বিনিময়। বস্তুত এই মুনাফার বিশ্বাস মানুষকে দিয়ে এমন অসাধ্য সাধন করায় যা স্থূল মুনাফায় বিশ্বাসী বস্তুবাদিগণ কল্পনাও করতে পারে না।

এটা আজ স্বীকৃত সত্য, সিয়াম (বা সাময়িক উপবাস) স্বাস্থ্যের জন্য শুধু উপকারীই নয়, বরং অপরিহার্যও বটে। স্বাস্থ্য বিজ্ঞানীদের পরামর্শ হলো, প্রত্যেক মানুষের জন্যই বছরের কয়েকটা দিন উপবাস থাকা উচিত। কেননা মাত্রাতিরিক্ত পানাহারের ফলেই অধিকাংশ ব্যাধির সৃষ্টি। দৈহিক ব্যাধি তো বটেই, এমন কি

নৈতিক ব্যাধিরও বড় কারণ এই মাত্রাতিরিক্ত পানাহার ও রকমারি খাদ্যসম্ভার সহযোগে ভূরিভোজন। এই একই কারণে মানুষ আজ দৈহিক ও দৈনিক অসংখ্য রোগ-ব্যাধির প্রকোপে দিশেহারা।

এতো গেল স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের বিনামূল্যে বিতরিত নসীহতের কথা। কিন্তু আপনি একটা নিরপেক্ষ জরিপ চালিয়ে বলুন তো নিছক অর্থনৈতিক কৃচ্ছতা কিংবা স্বাস্থ্যগত দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতি বছর কতজন লোক সিয়াম পালন করে থাকে? আমরা অত্যন্ত আস্থার সাথে এটা বলতে পারি, এ ধরনের লোকের সংখ্যা হাজারে নয়, লাখের ও একজনের বেশী হবে না, এমন কি শীত মৌসুমেও–যখন দিন খুবই ছোট হয়ে আসে– এ সংখ্যার কোন তারতম্য ঘটে না, অথচ স্বাস্থ্যগত কারণে যে সিয়ামের পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে সেখানে অতশত বিধি-নিষেধ ও কড়াকড়ির বালাই নেই। পক্ষান্তরে যদি এমন ব্যক্তিদের ওপর জরিপ চালানো হয়, যারা শুধু আল্লাহ্‌র নির্দেশ মনে করে এবং আখিরাত উত্তম পুরস্কার তথা জান্নাত প্রাপ্তির বিশ্বাস নিয়ে দীর্ঘ এক মাস একটানা সিয়াম পালন করে তবে দেখা যাবে, বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা, নৈতিক অবক্ষয় ও ধর্মীয় শিথিলতা সত্ত্বেও তাদের সংখ্যা লাখে ৯৯৯৯৯ জনের চেয়ে কম হবে না। প্রচণ্ড গরমের দীর্ঘতম দিনেও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এরা সিয়াম পালন করে থাকে। আর রাতে মশগুল থাকে সালাত, তিলাওয়াত ও অন্যান্য ইবাদতে। এর কারণ, ঈমানদারদের কাছে নবী-রাসূলদের মাধ্যমে প্রাপ্ত আখিরাতের লাভ ও মুনাফার মূল্য স্বাস্থ্য বিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের বর্ণিত স্থূল ও ক্ষণস্থায়ী মুনাফার চেয়ে অনেক বেশী। সিয়াম সম্পর্কে এমন সব সুসংবাদ ও মহাপুরস্কারের কথা তারা জানে যার সামনে একটি মাসের ক্ষুৎ-পিপাসার কষ্ট একেবারেই তুচ্ছ, উল্লেখের অযোগ্য।

হযরত আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম হাদীসে কুদসিতে ইরশাদ করেছেন ঃ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই কয়েক গুণ বৃদ্ধি করে দেয়া হয় এবং সাওয়াবও দশগুণ থেকে সাত শত গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় সিয়াম ব্যতীত। কেননা সিয়াম শুধু আমারই জন্য এবং আমিই তার বিনিময় দেব। আমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই শুধু সে পানাহার বর্জন করেছে, নফসের চাহিদা বিসর্জন দিয়েছে। সিয়াম পালনকারীদের জন্য দু'টি খুশির সময় আছে। একটি খুশি হচ্ছে ইফতারের সময়, আরেকটি খুশি হচ্ছে আপন প্রতিপালকের সাথে মিলিত হওয়ার

সময়। নিশ্চয় সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহ্‌র কাছে মিশ্‌কের চেয়েও প্রিয় ও পবিত্র।" [বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য]

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"জান্নাতের একটি দরজার নাম হবে রায়্যান অর্থাৎ পিপাসা নিবারক ও তৃপ্তিদায়ক। এটা শুধু সিয়াম পালনকারীর জন্যই সংরক্ষিত থাকবে। অন্য কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশের অনুমতি পাবে না। আর এ দরজা দিয়ে একবার যে প্রবেশ করবে সে কোনদিন পিপাসা অনুভব করবে না।"

[বুখারী, মুসলিম]

সিয়ামের হাকীকত ও মর্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা

রমাযান হচ্ছে একটি সার্বজনীন ইবাদত। মুসলিম উম্মাহ্‌র প্রতিটি সক্ষম ও প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ওপরই সিয়াম ফরয। রমাযানুল মুবারকের এই সার্বজনীনতা ও ব্যাপকতার কারণে এ আশংকা পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল, অন্যান্য ধর্মের মত একদিন হয়তো এই ইসলামী সিয়ামও সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে প্রাণহীন আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে। হয়তো অনেক লোক সমাজ ও পরিবেশের চাপে পড়েই শুধু সিয়াম পালন করবে। আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পরিবর্তে মানুষের সমালোচনা থেকে রেহাই পাওয়া কিংবা ধার্মিকরূপে প্রশংসা কুড়ানোই হবে সে সিয়ামের উদ্দেশ্য। আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি মুতাবিক উত্তম বিনিময় লাভের সুসংবাদের ওপর বিশ্বাস তার অন্তরে থাকবে অনুপস্থিত। আবার অনেকে হয়তো নিছক স্বাস্থ্যগত উপকারের কথা ভেবেই সিয়াম পালন করবে। এভাবে সিয়ামের আসল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যাবে। মানুষের এ দুর্বলতার কথা আল্লাহ্‌র পেয়ারা রাসূলের অগোচরে ছিল না। তাই এর প্রতিকারের ব্যবস্থাও তিনি করে গেছেন। অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় উম্মাহ্‌কে সতর্ক করে দিয়ে তিনি ইরশাদ করেছেন, সিয়ামের উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন এবং শুধু আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন। কেননা এমন সিয়ামই শুধু আল্লাহ্‌র নিকট গ্রহণযোগ্য যার মূল উপাদান হচ্ছে ঈমান ও ইহ্‌তিসাব (ছওয়াব প্রাপ্তি)।

ইরশাদ হয়েছে ঃ

"যে ব্যক্তি ঈমান ও ইহ্‌তিসাব তথা আল্লাহ্‌কে নিবেদন করে সিয়াম পালন করবে তার পূর্ব জীবনের সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী, মুসলিম]

মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের দুর্বলতম স্থানটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নয় এমন যে কোন ব্যক্তির কাছে উপরিউক্ত হাদীস শরীফে ঈমান ও ইহতিসাবের শর্তারোপের বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক মনে হতে পারে। কেননা রমাযানের সিয়াম তো কেবল মুসলমানগণই পালন করে থাকে এবং তা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশা নিয়েই। অতএব, নতুন করে ঈমান ও ইহতিসাবের শর্ত উত্থাপন একান্তই অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু মানব চরিত্রের গভীরে যারা প্রবেশ করেছেন এবং মানুষের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ও দুর্জ্ঞেয় মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে যাদের স্বচ্ছ ধারণা আছে রাসূলুল্লাহ্র এ সুদূরপ্রসারী ও মহাপ্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যবস্থাপত্র দেখে অবশ্যই তারা বিস্মিত মুগ্ধতায় এবং ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করে দেবে এবং মুক্ত কণ্ঠে এ কথা স্বীকার করে নিতে বাধ্য হবে, আল্লাহ্র রাসূল নিজে থেকে কখনো কিছু বলেন নি, যা কিছু বলেছেন আহ্কামুল হাকিমীনের নির্দেশেই বলেছেন। ঈমান ও ইহতিসাবের ব্যাখ্যা প্রসংগে অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"(ঈমান ও ইহতিসাবের অর্থ হলো) মানুষ তার যাবতীয় কাজকর্ম ও ইবাদত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও উত্তম বিনিময় লাভের প্রত্যাশায় করবে।"

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে 'আস (রা.) রেওয়ায়েত করেছেন, "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ যে ব্যক্তি ছওয়াবের প্রত্যাশা ও বিশ্বাস নিয়ে তার সকল কাজ আঞ্জাম দেবে আল্লাহ্ তাকে এই বিশ্বাস ও প্রত্যাশার বিনিময়ে জান্নাত দেবেন।" [বুখারী]

সিয়ামের বাহ্যরূপ তথা বিধি-বিধানের ওপর গুরুত্বারোপের সাথে সাথে ইসলামী শরীয়ত সিয়ামের উদ্দেশ্য, হাকীকত ও মর্ম অনুধাবন ও সংরক্ষণেরও আহ্বান জানিয়েছে সমান গুরুত্বের সাথে। একদিকে সে যেমন নির্দেশ দিয়েছে পানাহার বর্জন ও জৈবিক চাহিদা পরিহার করে চলার, অন্যদিকে সে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আহবান জানিয়েছে এমন সব অন্যায় ও অপরাধ সযত্নে পরিহার করে চলার যা সিয়ামের ভাবমূর্তি বিনষ্টকারী, সিয়ামের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী এবং সিয়ামের নৈতিক ও চারিত্রিক সুফল লাভের পক্ষে অন্তরায়। সিয়াম হচ্ছে তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতা, শালীনতা, উন্নত নৈতিকতা, আত্মার সজীবতা

ও চিন্তার বিশুদ্ধতা অর্জনের এক বলিষ্ঠ মাধ্যম। তাই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"সিয়ামরত অবস্থায় তোমাদের কেউ যেন অশালীন ও অর্থহীন কথাবার্তায় লিপ্ত না হয়। কেউ যদি তাকে অশালীন কথা বলে কিংবা তার সাথে অকারণে বাদানুবাদে লিপ্ত হতে চায় তবে সে যেন একথা বলে দেয়, আমি রোযাদার।" [বুখারী শরীফ]

আল্লাহ্র পেয়ারা হাবীব আরো ইরশাদ করেছেন, "যে রোযা রেখেছে, অথচ মিথ্যাচার পরিহার করেনি, তার এই কৃত্রিম পানাহার বর্জনের কোন প্রয়োজন আল্লাহ্র নেই।" [বুখারী, মুসলিম]

বস্তুত যে সিয়াম তাকওয়া ও হৃদয়ের পবিত্রতাশূন্য এবং চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও চিন্তার বিশুদ্ধতাবঞ্চিত, সে সিয়াম হচ্ছে প্রাণহীন এক দেহ যা শুধু স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্গন্ধই ছড়ায়। হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

"অনেক সিয়াম পালনকারী এমন যাদের ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত থাকাই সার হয়েছে। তদ্রূপ অনেক ইবাদতগুযার এমন যাদের বিনিদ্র রাত কাটানোই সার হয়েছে।" [বুখারী, আবূ দাউদ ও তিরমিযী]

হযরত আবূ উবায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "সিয়াম হচ্ছে ঢালস্বরূপ যদি না সে নিজেই তা ফুটো করে দেয়।" (নাসাঈ শরীফ) 'আওসাত' গ্রন্থে উপরিউক্ত হাদীসের সাথে একথাও আছে, "সাহাবাগণ আরয করলেন, কোন্ জিনিস দ্বারা তা ফুটো হয়ে যায়?" ইরশাদ হলো, "মিথ্যা কথা ও গীবত দ্বারা।"

ইসলামী সিয়াম শুধু গুটি কতেক নেতিবাচক বিষয় ও নির্দেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং অনেক ইতিবাচক বিষয় ও নির্দেশও এর অন্তর্ভুক্ত। সিয়ামকে যেমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে পানাহার ও জৈবিক চাহিদা বর্জনের, গীবত ও পরচর্চা পরিহারের, ঝগড়া-বিবাদ ও যাবতীয় অশ্লীলতা ত্যাগ করার, তদ্রূপ অত্যন্ত কঠোর তাগিদের সাথে তাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ইবাদত, তিলাওয়াত, যিকর ও তাসবীহ মগ্ন থেকে এবং সমবেদনা, সহানুভূতি, সদয় আচরণ ও দানশীলতার

মাধ্যমে পরকালীন কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রশস্ত করে নেয়ার। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

"রমাযানুল মুবারকে যে কেউ কোন একটি নেক আমল দ্বারা আল্লাহ্র নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করতে চাইবে তার সে আমল অন্য সময়ের ফরযের তুল্য গণ্য করা হবে এবং যে ব্যক্তি রমাযানুল মুবারকে একটি ফরয আদায় করবে সে অন্য সময়ের সত্তরটি ফরযের তুল্য পুণ্য অর্জন করবে। এটা ধৈর্যের মাস এবং ধৈর্যের বিনিময় হচ্ছে জান্নাত। আর এই মাস মানুষের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাস।" [বায়হাকী, হযরত সালমান ফারসী (রা.) থেকে]

হযরত যায়েদ ইবনে খালিদ জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কোন রোযাদারকে যে ব্যক্তি ইফতার করাবে সে উক্ত রোযাদারের বরাবর ছওয়াব লাভ করবে, অথচ এর কারণে রোযাদারের পুণ্য হ্রাস করা হবে না।" [তিরমিযী শরীফ]

এই উম্মাহ্র ওপর আল্লাহ্র আরেকটি বিশেষ নিয়ামত ও দান হলো, মুসলমানদের হৃদয়ে সারা দিনের সিয়াম সাধনার পর তারাবীহ্র সালাতকেও নিষ্ঠার সাথে পালন করার জন্য অফুরন্ত উৎসাহ, উদ্দীপনা ও জযবা দান করেছেন। তারাবীহ্র সালাতের প্রতি যুগে যুগে এ উম্মাহ যে গভীর দরদ ও অন্তরঙ্গ প্রেমের পরিচয় দিয়ে এসেছে তার তুলনা ধর্মের ইতিহাসে মেলা ভার।

বস্তুত বহু প্রামাণ্য হাদীস গ্রন্থেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ইমামতিতে সালাতে তারাবীহ্ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে। তবে একাধারে তিনদিন জামা'আতের সাথে তারাবীহ্ আদায়ের পর জামা'আত অনুষ্ঠান থেকে তিনি বিরত হন। কেননা তাঁর আশংকা হচ্ছিল, হয়তো এটা ফরয করে দেয়া হবে আর উম্মতের জন্য তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, এক রমাযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বেশ বিলম্ব করে ঘরে থেকে বের হলেন এবং মসজিদে সালাত আদায় করলেন। তাঁর সাথে আরো কিছু লোক সালাত আদায় করল। সকালে ব্যাপারটা জানাজানি হলো। ফলে দ্বিতীয় রাতে আরো বেশী সংখ্যক লোক সে জামা'আতে শরীক হলো। সকালে ব্যাপারটা আরো জানাজানি হলো। ফলে তৃতীয় রাতে মুসল্লীদের সংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেল। তখন রাসূল-

ল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম বাইরে তশরীফ নিয়ে গেলেন এবং সালাত আদায় করলেন। সকলেই তাঁর পেছনে জামা'আত আদায় করল। চতুর্থ রাতে মুসল্লীদের প্রচণ্ড ভিড়ে মসজিদে স্থান সংকুলান হলো না। সকলেই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের অপেক্ষায় বসে রইল। ফজরের নামাযের সময় তিনি মসজিদে তশরীফ আনলেন এবং সালাত আদায়ের পর সমবেত সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের উপস্থিতি আমার অজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছিল, শেষে হয়তো এ সালাত তোমাদের ওপর ফরয করে দেয়া হবে। আর তোমরা তা পালন করতে অপারগ হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পরও এ অবস্থা বিদ্যমান ছিল। (বুখারী) তারপর সাহাবাগণ সর্বসম্মতভাবে তারাবীহ্‌র জামা'আত শুরু করলেন। বলা বাহুল্য, সালাতে তারাবীহের ব্যাপারেও তাঁরা তাঁদের স্বভাবসুলভ নিষ্ঠা ও একাগ্রতার পরিচয় দিয়েছেন।

সাহাবা কিরামের পর পরবর্তীকালের উম্মত উত্তরাধিকারসূত্রে এ মহামূল্যবান সম্পদ লাভ করল এবং এর হিফাজত ও সংরক্ষণের ব্যাপারেও তারা অত্যধিক যত্নবান ছিল। এমন কি এটা আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত তথা হকপন্থীদের বৈশিষ্ট্য ও প্রতীকরূপে স্বীকৃতি লাভ করল। হিফ্‌জে কুরআনের এই ব্যাপাক প্রসারের পেছনেও সালাতে তারাবীহ্‌র অবদান অনস্বীকার্য। হাফিজ সাহেবগণ সারা বছর ধরে কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকেন এবং রমাযানুল মুবারকে তারাবীহ্‌র জামা'আতে খতমে কুরআন অনুষ্ঠানের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কত লক্ষ পবিত্র সিনায় এরই বদৌলতে আল্‌-কুরআন আজ সংরক্ষিত হয়ে আছে। পৃথিবীর সকল তাগুতি শক্তি মিলে, প্রচার ও প্রকাশনার যাবতীয় উপায়-উপকরণ ব্যবহার করেও কি আল্‌-কুরআনের একটি হরফের সামান্য পরিবর্তন সাধন করতে পারবে? সালাতে তারাবীহ্‌র আরেকটি বড় ফায়দা এই, এর বদৌলতে সাধারণ মুসলমানগণ আংশিকভাবে হলেও রাত্রি জাগরণ ও ইবাদাতের সৌভাগ্য লাভ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

বস্তুত জীবন্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি মাত্রই জানেন, রমাযানুল মুবারক হচ্ছে ইবাদত, তিলাওয়াত ও সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বিশেষ করুণা ও সন্তুষ্টি লাভের মৌসুম। কোকিল যেমন বসন্তের আগমন অপেক্ষায় কাটিয়ে দেয় শরৎ ও হেমন্তকাল, আল্লাহ্‌র নেক বান্দারাও তদ্রূপ রমাযানের নতুন চাঁদের অপেক্ষায়

কাটিয়ে দেয় সারা বছর। বসন্তের আগমনের আনন্দে কোকিল যেমন বাগান মুখরিত করে তোলে তার সুমিষ্ট স্বরের কলকাকলিতে, তেমনি আল্লাহ্‌র ঘর মসজিদেও রমাযানের সারা মাস মুখরিত থাকে তিলাওয়াত ও যিকিরের গুঞ্জরণে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দাদের রাত্রি জাগরণে। বসন্তের আগমনে বাগান যেমন লাভ করে সবুজের স্নিগ্ধ পরশ, আমোদিত হয় ফুলের মন মাতানো সৌরভে, আল্লাহ্‌র নেক বান্দাদের হৃদয়-উদ্যানও রমাযানের শুভাগমনে লাভ করে এক অপূর্ব সবুজ সজীবতা! ইবাদতের আগ্রহ, আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা, সৎ কাজের আকাঙ্ক্ষা, হৃদয়ের আর্দ্রতা এবং লজ্জা ও অনুশোচনার দহন এতো প্রচণ্ডতা ও তীব্রতা লাভ করে যা অন্য মাসে কল্পনাও করা যায় না। আর এটা শুধু এই উম্মাহ্‌রই একক বৈশিষ্ট্য। দুনিয়ার অন্য কোন জাতির ইতিহাসে এর তুলনা পাওয়া যায় না। "সেটা আল্লাহ্‌র দান, যাকে ইচ্ছা দান করেন। আর আল্লাহ্‌র দান অপরিসীম।"

মুসলমানদের ক্ষমাহীন উদাসীনতা

তিক্ত হলেও এ সত্য অস্বীকার করার কোন উপায় নেই, পরবর্তীকালের মুসলমানগণ রমাযানুল মুবারকের প্রতি অমার্জনীয় উদাসীনতা প্রদর্শন করেছে এবং নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এই পবিত্র মাসের মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষায়। ফলে মুসলিম উম্মাহ্‌ রমাযানুল মুবারকেও সিয়ামের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ থেকে হয়েছে বঞ্চিত। ইফতারের সুন্নতকে তারা পরিণত করেছে ব্যয়বহুল এক বিলাসী ভোজ অনুষ্ঠানে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় যেন সারা দিনের ক্ষুধা ও পিপাসার মূল্য সুদে-আসলে আদায় করে নিতে তারা বদ্ধপরিকর। ফলে সিয়ামের ভাবমূর্তিই কেবল ক্ষুণ্ন হয়নি, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংশোধনের ক্ষেত্রেও সিয়াম একেবারেই শক্তিহীন হয়ে পড়েছে।

ইমাম গাযালী রহমাতুল্লাহি আলায়হি অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণভাবে এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"সিয়ামের কাঙ্ক্ষিত ফল লাভের জন্য অন্যতম শর্ত হলো, হালাল খাদ্য গ্রহণের বেলায়ও যথেষ্ট সংযমের পরিচয় দিতে হবে। এতো অধিক পরিমাণ কিছুতেই খাওয়া উচিত নয় যার পর আর একটি গ্রাসেরও অবকাশ না থাকে। কেননা পূর্ণ উদর আল্লাহ্‌র কাছে খুবই নিন্দনীয়। ইফতারের উদ্দেশ্য যদি হয়

সারা দিনের উপবাসের মূল্য সুদে-আসলে আদায় করে নেয়া, তবে সে সিয়াম নফসের খাহেশাত তথা পাশবিকতা দমনে কি সাহায্য করতে পারে? এ অপচয়মূলক অভ্যাস মুসলমানদের মধ্যে এতটাই শিকড় গেড়ে বসেছে যে, অনেকেই সারা বছর ধরে রমাযানের জন্য খাদ্য সম্ভার সংগ্রহের আয়োজনে মগ্ন থাকে। আর রমাযানে এতো রকমারি ও উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত করা হয় যার সিকি ভাগও অন্যান্য মাসে করা হয় না। রোযার উদ্দেশ্য তো হচ্ছে ক্ষুধা ও পিপাসার যন্ত্রণার মাধ্যমে নফসের খাহেশাত তথা পাশবিকতা দমন করা, মানুষের মধ্যে তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির প্রশংসিত গুণ সৃষ্টি করা। কিন্তু কেউ যদি সারা দিন নিজেকে অভুক্ত রেখে সূর্যাস্তের পর ইফতারের নামে রকমারি ও উপাদেয় খাদ্য-দ্রব্যাদি দ্বারা উদর পূর্ণ করে নেয়, তবে তো নফসের পাশবিকতা অবদমিত হওয়ার পরিবর্তে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, হতে পারে, অনেক সুপ্ত পাশবিক শক্তিও তখন জেগে উঠবে।

"রমযানের মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে নফসের সেই অশুভ শক্তিকে দুর্বল করা যা শয়তান মানুষের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করে থাকে। এটা সম্ভব হতে পারে কেবল খাদ্য বর্জন ও সংকোচনের মাধ্যমেই অর্থাৎ সাহরী ও ইফতারের সময় ততটুকুই খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যতটুকু অন্য সময় করা হয়। কিন্তু কেউ যদি সারা দিনের হিসেবে সুদে-আসলে আদায় করে নিতে বদ্ধপরিকর হয় তবে সিয়ামের ফল লাভ থেকে সে অবশ্যই বঞ্চিত হবে।"

"এমন কি অধিক দিবা নিদ্রাও ত্যাগ করতে হবে যেন ক্ষুধা-পিপাসার অনাস্বাদিতপূর্ব স্বাদ পূর্ণরূপে অনুভব করার সুযোগ হয়, পাশবিক শক্তি নিস্তেজ হতে পারে এবং হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও আত্মার পবিত্রতা অর্জিত হতে পারে। হৃদয় ও আত্মার এই স্বচ্ছতা ও পবিত্রতাই মানুষকে ঊর্ধ্ব জগতের সমুদয় রহস্য অবলোকনের যোগ্য করে তুলবে।"

"তদ্রূপ রাতেও এতো অধিক পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত নয় যা তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য ইবাদতে মশগুল হতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।"

[এহয়াউল উলুম, পৃ. ২১১]

তাহ্‌রীফ (বিকৃতি) ও সীমালংঘনের কবল থেকে হিফাজত

সিয়ামের আহ্‌কামে কঠোরতা ও মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির মাধ্যমে নতুন ফিতনা সৃষ্টিরও সমূহ আশংকা ছিল। কেননা অত্যুৎসাহী অনেকেই এরূপ ধারণা করে বসত, সিয়ামের উদ্দেশ্য হচ্ছে কঠোর নির্যাতনের মাধ্যমে আত্মার দমন এবং কঠোর থেকে কঠোরতম মুজাহাদার মাধ্যমে সকল পাশবিকতার শিকড় উৎপাটন। অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে যত কঠিন মুজাহাদা ও অমানুষিক কষ্টে লিপ্ত করবে, পানাহারসহ যাবতীয় আরাম-আয়েশ যত বেশী বর্জন করবে, ক্ষুৎ পিপাসার যাতনা যত বেশী বরদাশ্‌ত করবে, আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্যও সে তত বেশী লাভ করতে সক্ষম হবে। এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়েই ইসলাম-পূর্ব বিভিন্ন ধর্মের অনুসারিগণ সাধারণভাবে সকল ইবাদতের ব্যাপারে, বিশেষভাবে সিয়ামের ব্যাপারে চরম বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে সিয়ামের বিধানকে তারা একটি আত্মনির্যাতনমূলক কঠোর অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিল। কেউ কেউ উপবাসের সময়সীমা বাড়ানোর জন্য ইফতারের সময়কে বিলম্বিত ও সাহরীর সময়কে ত্বরান্বিত করতো। কেউ বা সাহরীর সময় খাদ্য স্পর্শই করত না। অনেকের বাড়াবাড়ি এত দূর অতিক্রম করে গিয়েছিল, রাত-দিন একাকার করে দিনের পর দিন তারা একটানা উপবাস ব্রত পালন করত। কেননা তাদের ধারণা ছিল এই, পানাহারের প্রয়োজন আসলে একটি লজ্জাজনক মানবীয় দুর্বলতা এবং এই দুর্বলতা থেকে যে নিজেকে যত বেশী মুক্ত করতে সক্ষম হবে আধ্যাত্মিক জগতে সে তত বেশী উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হবে।

এই ভ্রান্ত ধারণা ও বিকৃত মানসিকতা ক্রমে মুসলমানদের মধ্যেও অনুপ্রবেশ লাভ করে। তাদের মধ্যেও শুরু হয় সিয়ামের ব্যাপারে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি, এমন কি একটানা চল্লিশ দিন সিয়াম পালন প্রথাও চালু হয়ে যায়। বস্তুত এ ধরনের মানসিকতা ধর্মের বিকৃতি, আত্মনির্যাতন ও বৈরাগ্য অবলম্বনেরই নামান্তর। এর মাধ্যমে আসলে ফিতনার এক সুপ্রশস্ত দরজাই উন্মুক্ত করে দেয়া হচ্ছে। সর্বোপরি এর অর্থ হচ্ছে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র বিধান অস্বীকার করা। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন ঃ

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

“আল্লাহ্ তোমাদের সাথে নম্রতাই পছন্দ করেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের সাথে কঠোরতা পছন্দ করেন ন [আল বাকারা ঃ ১৮৫]

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ -

“ধর্মের ব্যাপারে তিনি তোমাদের ওপর কোনরূপ সংকীর্ণতা করেন নি।”

[সূরা হজ্জ ঃ ১৮]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

“ধর্ম সহজ ব্যাপার। ধর্মের ব্যাপারে যে বাড়াবাড়ি করবে (এবং নিজের শক্তি দেখাতে গিয়ে কঠোরতা অবলম্বন করবে) সে অবশ্যই বিপর্যস্ত হবে। অতএব, সঠিক ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর।” [বুখারী শরীফ]

উপরিউক্ত দিকসমূহ বিবেচনা করেই ইসলাম সম্ভাব্য সকল ফিতনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছে চিরতরে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতকে সর্বাবস্থায় নিয়মিত সাহরী খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করেছেন। হযরত আনাস বিন মালিক (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, “সাহরী খাওয়ার ব্যাপারে তোমরা যত্নবান হও। কেননা সাহরীতে বরকত নিহিত রয়েছে।” [বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী]

হযরত আমর বিন ‘আস (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, “আমাদের ও আহলে কিতাবদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী বিষয় হচ্ছে সাহরী।” [মুসলিম শরীফ]

ইফতারের সময় অযথা বিলম্ব করার ব্যাপারেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে, “এই উম্মাহ যতদিন প্রথম সময়ে ইফতার করার ব্যাপারে যত্নবান হবে ততদিন তারা কল্যাণের পথে থাকবে।”

[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, “লোকেরা যতদিন প্রথম সময়ে ইফতার করবে ততদিন ইসলাম বিজয়ী থাকবে। কেননা ইয়াহূদী ও নাসারাগণ ইফতারে বিলম্ব করে থাকে।” [আবূ দাঊদ]

তদ্রূপ সাহরীতে বিলম্ব করা ও শেষ সময়ে সাহরী খাওয়া রাসূলুল্লাহ্ সুন্নত। সাহাবাগণ এ ব্যাপারেও ছিলেন পুরোপুরি যত্নবান। হযরত যায়েদ বিন ছাবিত

(রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের সাথে সাহরী খেলাম ও সাথে সাথেই সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। প্রশ্ন করা হলো : মাঝখানে কতটুকু বিরতি ছিল? উত্তরে তিনি বললেন, "এই ধর, পঞ্চাশ আয়াত পড়তে যতটুকু সময় লাগে।" [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত ইবনে উমর (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের দু'জন মুয়ায্যিন ছিলো ঃ একজন হলেন বিলাল (রা.), অপরজন ইবনে উম্মে মাকতূম (রা.)। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ বিলালের আযান রাত বাকি থাকার আলামত। ইবনে উম্মে মাকতূমের আযান ধ্বনিত না হওয়া পর্যন্ত তোমরা পানাহার চালিয়ে যাও।" ইবনে উমর (রা.) বলেছেন, "অথচ উভয় আযানের মাঝে শুধু এতোটাকু সময় ছিল যে, একজন নামতেন, অপরজন উঠতেন।

এ সম্পর্কে হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি বেশ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"সিয়ামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোরতা ও বাড়াবাড়ির পথ রোধ করে দেয়া। কেননা ইয়াহূদী, নাসারা ও স্বয়ং আরবদের মধ্যেও এই ইবাদতের প্রথা ছিলো। এ ব্যাপারে তারা মাত্রাতিরিক্ত কঠোরতা ও বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। কেননা তাদের ধারণা ছিল, সিয়ামের লক্ষ্যই হচ্ছে আত্মদমন। তাই আত্মাকে কঠোর নির্যাতনের মধ্যে নিক্ষেপ করার জন্য তারা নিজেদের মনগড়া বিভিন্ন পন্থা উদ্ভাবন করত। বস্তুত এটাই হচ্ছে বিকৃতির উৎস।"

এ বিকৃতি হতে পারে সংখ্যাগত, আবার হতে পারে চরিত্রগত। প্রথমটির দৃষ্টান্ত হলো রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লামের নিম্নোক্ত ইরশাদ ঃ

"রমযানের সংলগ্ন পূর্বে কেউ একটি বা দু'টি রোযা যেন না রাখে।"

তদ্রূপ ঈদের দিনে কিংবা সন্দেহমূলকভাবে শা'বান মাসের ২৯ তারিখে রোযা রাখার ব্যাপারেও তিনি নিষেধ করেছেন। কেননা কঠোরতাপ্রিয় লোকদের মধ্যে এই রোযার প্রথা চালু হয়ে গেলে অন্যরাও তাদের অনুকরণ শুরু করবে এবং ক্রমেই সেটা তাহরীফ বা বিকৃতির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়াবে।

দ্বিতীয়টির দৃষ্টান্ত হচ্ছে বিরতিহীন রোযা সম্পর্কে নিষেধ বাণী, সাহরীর প্রতি উৎসাহ দান এবং প্রথম সময়ে ইফতার করার নির্দেশ দান। [হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, খণ্ড ১,

প্রকৃতপক্ষে সিয়ামের অর্থই হলো, আল্লাহ্‌র নির্দেশের কাছে স্বতঃস্ফূর্ত ও নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ, আল্লাহ্‌র নির্দেশে গ্রহণ ও বর্জন। আর আল্লাহ্‌র নির্দেশ হলো ফজর থেকে নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত পানাহার ও জৈবিক চাহিদা বর্জন তা, যত তীব্রই হোক ক্ষুধা ও পিপাসা এবং যত উন্মত্তই হোক তার যৌন চাহিদা। তদ্রূপ সূর্যাস্তের পরপরই খাদ্য গ্রহণ ও ইফতারের নির্দেশ রয়েছে। যতই প্রবল হোক তার ত্যাগ ও আত্মদমনের ইচ্ছা। কেননা নফসের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর সিয়ামের ভিত্তি নয়। সিয়ামের ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র নির্দেশ পালনের ওপর। সে নির্দেশ লংঘনের অর্থই হবে ধর্মের প্রতি বিদ্রোহ এবং আল্লাহ্‌র মুকাবিলায় শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া। গ্রহণ ও বর্জনের বেলায় রোযাদার নিজের নফসের ইচ্ছা-অনিচ্ছার যতটা ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহ্‌র নির্দেশের যতটা অনুগত হবে তার আবদিয়াতের প্রকাশ ততটাই নির্ভেজাল ও পবিত্র বলে আল্লাহ্‌র দরবারে বিবেচিত হবে।

হযরত মুজাদ্দিসে আলফে সানী রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন ঃ

"সাহরীতে বিলম্ব ইফতারে তাড়াহুড়ো করার মাধ্যমে মানুষের অক্ষমতা ও দুর্বলতাই প্রকাশ পায় এবং এটা তার আবদিয়াতের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ্‌র ইচ্ছাও হচ্ছে যে, মানুষ তার সামনে নিজের অক্ষমতা ও দুর্বলতা তথা আবদিয়াত প্রকাশ করুক।" [মকতুবাতে ইমামে রব্বানী, মকতুব নং ২৫]

ই'তিকাফ

ই'তিকাফ হচ্ছে রমাযানুল মুবারকের সামগ্রিক কল্যাণ ও বরকত লাভের জন্য একটি বলিষ্ঠ সহায়ক শক্তি। রমাযানের প্রথম অংশে কোন কারণে যদি পূর্ণ আত্মিক প্রশান্তি, স্থির চিত্ততা, চিন্তা ও হৃদয়ের একাগ্রতা আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও তাঁর রহমতের দুয়ারে পড়ে থাকার সৌভাগ্য অর্জিত না হয়, তার জন্য পরম করুণাময় আরহামুর রাহিমীন একটি শেষ সুযোগের ব্যবস্থা করেছেন, যেন সে অতি সহজেই তার সে অপূরণীয় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে ই'তিকাফের মাধ্যমে।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম লিখেছেন ঃ

"ই'তিকাফের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে গায়রুল্লাহ্‌র মোহনীয় বেড়াজাল থেকে মুক্তি লাভ করে আল্লাহ্‌র সাথে পরিপূর্ণ ও গভীর প্রেমময় সম্পর্ক স্থাপন।

রমযানের পবিত্র মাসে আল্লাহ্‌র ঘরে নির্জন বাস ও ই'তিকাফের মাধ্যমে হৃদয় ও আত্মার এমন অভাবনীয় উৎকর্ষ সাধিত হয় যে, মানুষের হৃদয়ে তখন আল্লাহ্‌র যিকির ও তাঁর প্রতি গভীর প্রেম ছাড়া অন্য কিছু স্থান পায় না। মহান প্রতিপালকের ধ্যান-চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা-ভাবনাতেই সে উৎসাহ বোধ করে না। তার হৃদয়ের সকল অনুভূতি তখন আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও সহায়ক হয়ে থাকে। মাখলুকের সাথে ঘনিষ্ঠতা ও গভীরতার পরিবর্তে আল্লাহ্‌র সাথে ঘনিষ্ঠতা ও গভীরতা সৃষ্টি হয় কবরের নিঃসঙ্গ অন্ধকারে, যেখানে কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকবে না –এই সম্পর্কটি এক মহামূল্যবান পাথেয়রূপে কাজে আসবে। এই হলো ই'তিকাফের উদ্দেশ্য ও রমাযানুল মুবারকের সর্বোত্তম শেষ দশ দিনের সাথে একে সম্পৃক্ত করার গভীর তাৎপর্য।"

[যাদুল মা'আদ ঃ ১৮৭]

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলায়হি লিখেছেন ঃ

"মসজিদের ই'তিকাফ হচ্ছে আত্মিক প্রশান্তি, হৃদয়ের পবিত্রতা, চিন্তার বিশুদ্ধতা, ফিরিশতাকুলের গুণাবলী অর্জন, শবে কদরের সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভসহ সকল প্রকার ইবাদতের অখণ্ড সুযোগ লাভের এক সর্বোত্তম উপায়। তাই আল্লাহ্‌র রসূল রমাযানুল মুবারকের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করেছেন এবং উম্মতের সৎ ও ভাগ্যবান লোকদের জন্য তা সুন্নতরূপে ঘোষণা করেছেন।"

[হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা ঃ খণ্ড ২, পৃঃ ৪২]

এজন্যই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম প্রতি রমাযানে অত্যন্ত আগ্রহ ও গভীর আত্মনিমগ্নতার সাথে ই'তিকাফ পালন করেছেন এবং যুগে যুগে মুসলিম উম্মাহও যথার্থ নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সাথে এই নববী সুন্নতের ওপর আমল করে এসেছেন। ফলে ই'তিকাফ রমাযানুল মুবারকেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেন, "ওফাতের পূর্ব পর্যন্ত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম রমাযানের শেষ দশ দিন বরাবর ই'তিকাফ পালন করেছেন এবং তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ ই'তিকাফের এ পুণ্য ধারা অব্যাহত রেখেছেন।" [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন ঃ "প্রতি রমাযানেই রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। কিন্তু ওফাত-পূর্ব রমযানে ই'তিকাফ করেছেন বিশ দিন।" [বুখারী শরীফ]

কুরআন ও হাদীসের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শবে কদরের অসীম ফযীলত ও মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে। আল্-কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ - وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ - لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ - تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ
أَمْرٍ - سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ -

"নিঃসন্দেহে আমি তা লায়লাতুল কদরে অবতীর্ণ করেছি। আর আপনি কি জানেন লায়লাতুল কদর কি? লায়লাতুল কদর হাযার মাসের চেয়ে উত্তম। এই রাতে ফিরিশতাগণ ও রূহুল কুদুস স্বীয় প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে প্রতিটি মঙ্গলময় বস্তু নিয়ে অবতরণ করেন। (আর এই রাত) আগাগোড়া শান্তি। তা (বিরাজ করে) সূর্যোদয় পর্যন্ত।" [সূরাতুল কদর]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "লায়লাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাব সহকারে যে ব্যক্তি ইবাদত করবে তার পূর্ব জীবনের সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" [বুখারী ও মুসলিম]

মহাপ্রজ্ঞা ও করুণার অধিকারী আল্লাহ্ পাক লায়লাতুল কদরকে রমাযানের শেষ দশ দিনের মধ্যে গোপন রেখেছেন যেন মুসলমানগণই তার সন্ধানে ব্যাপৃত হয় এবং লায়লাতুল কদরের সৌভাগ্য লাভের প্রত্যাশায় উদ্যম ও চঞ্চলতা নিয়ে সব ক'টি রাতই কাটিয়ে দেয় ইবাদতের নিমগ্নতায়। কেননা এতে মানুষেরই কল্যাণ। রমাযানের শেষ দশ দিন মুসলমানদের কিভাবে কাটাতে হবে, নিজেকে দিয়েই আল্লাহ্র রাসূল তা দেখিয়ে গেছেন। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেন ঃ

"রমাযানের শেষ দশদিন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম সারা রাত জেগে ইবাদত করতেন এবং ঘরের অন্যদেরও জাগিয়ে দিতেন। তখন তাঁর ইবাদত নিমগ্নতা ছিল দেখার মত।" [বুখারী ও মুসলিম]

অধিকাংশ হাদীস দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয়, লায়লাতুল কদর রমাযানের শেষ দশ দিনে এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে শেষ সাত দিনের যে কোন বেজোড় রাতে নিহিত রয়েছে। আবদুল্লাহ্ ইবনে উমর (রা.) থেকে রিওয়ায়েত আছে,

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লামের কতিপয় সাহাবা স্বপ্নযোগে দেখলেন, লায়লাতুল কদর রমাযানের শেষ সাত দিনে রয়েছে। তখন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন, দেখা যাচ্ছে তোমাদের স্বপ্ন অধিকাংশই শেষ সাত দিন সম্পর্কে। অতএব, যে ব্যক্তি 'লায়লাতুল কদরের সন্ধান পেতে চায় সে রমাযানের শেষ সাত দিনের মধ্যেই সন্ধান করুক। [বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রিওয়ায়েত করেছেন, "রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রমাযানের শেষ দশ দিন নির্জন ই'তিকাফে বসে যেতেন এবং বলতেন, শেষ দশ দিনে লায়লাতুল কদরের সন্ধান করো।"

[বুখারী ও মুসলিম]

হযরত আয়েশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "শেষ দশ দিনের বেজোড় রাতে লায়লাতুল কদরের অনুসন্ধান কর।" [বুখারী শরীফ]

সিয়ামে ইসলামের বিপ্লবী সংস্কার

অন্যান্য ইবাদতের মত সিয়ামের মধ্যেও ইসলাম বেশ কিছু মৌলিক ও বৈপ্লবিক সংস্কার সাধন করেছে। এই ইসলামী সংস্কারের ফলে সিয়াম বেশ আনন্দদায়ক এবং মানুষের স্বভাব ও ফিতরতের অনেক নিকটবর্তী হয়েছে, হয়েছে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক। সমাজের সর্বস্তরে এ সংস্কারের সুদূরপ্রসারী প্রভাব সুস্পষ্ট।

ইসলামের সর্বপ্রধান সংস্কার হচ্ছে সিয়ামের ধারণাগত পরিবর্তন। একথা ওপরে বর্ণিত হয়েছে, ইয়াহূদীদের দৃষ্টিতে রোযা ছিল বেদনা ও শোকের প্রতীক এবং বিভিন্ন জাতীয় বিপর্যয় ও শোকাবহ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর স্মারক। এই হতাশাব্যঞ্জক অন্ধকার ধারণা ইসলাম স্বীকার করেনি। ইসলামের দৃষ্টিতে সিয়াম হচ্ছে এমন এক সার্বজনীন ইবাদত যা রোযাদারকে দান করে আত্মার সজীবতা, হৃদয়ের পবিত্রতা ও চিন্তার বিশুদ্ধতা। এ সিয়ামের মাধ্যমেই সে লাভ করে বন্দেগী ও ইবাদতের অপার্থিব স্বাদ, লাভ করে নতুন উদ্যম ও প্রেরণা। সিয়ামের জন্য আল্লাহ্ পাক যে মহাপুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছেন তা এক মুহূর্তে মানুষকে করে তোলে ভোগে বিতৃষ্ণ ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ এবং আত্মবিশ্বাস ও ভবিষ্যত আশাবাদে বলীয়ান।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেছেন “ ‘সিয়ামই একমাত্র ইবাদত যার বিনিময় বান্দাকে আমি নিজ হাতে দান করব।” একই হাদীসে আরো ইরশাদ হয়েছে ঃ সিয়াম পালনকারী দু'টি আনন্দ লাভ করে। একটি আনন্দ হলো ইফতারের মুহূর্তে আরেকটি হবে রব ও প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের (অকল্পনীয়) মুহূর্তে,

একজন রোযাদার নির্মল পবিত্রতা, উন্নত নৈতিকতা, আল্লাহ্র নৈকট্য ও সান্নিধ্য লাভের সাধনা এবং পারস্পরিক কল্যাণ কামনার এমন স্নিগ্ধ স্বর্গীয় পরিবেশে তার মুহূর্তগুলো অতিবাহিত করে, পৃথিবীর কোন আবিলতা ও পংকিলতাই তখন তাকে স্পর্শ করতে পারে না, এমন কি রোযাদারের সব কিছুই তখন আল্লাহ্র কাছে একান্ত প্রিয় হয়ে ওঠে।

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে ঃ

“রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ্র কাছে ‘মিশ্‌কের সুগন্ধি’র চেয়ে বেশী প্রিয়।”

বলা বাহুল্য, শোক, হতাশা, অনিশ্চয়তা ও হীনমন্যতাবোধের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশের তুলনায় আশা-উদ্দীপনা, আত্মবিশ্বাস ও পুরস্কার প্রাপ্তির প্রত্যাশাপূর্ণ পরিবেশই মানবীয় ফিতরতের সাথে অধিক সংগতিপূর্ণ।

সিয়াম সম্পর্কে ইয়াহূদী ধর্মের আরেকটি ধারণা হলো, এটা আত্মাকে দমন ও শাস্তি দানের একটি প্রকৃষ্ট উপায়। ইয়াহূদী ধর্ম গ্রন্থসমূহে যত্রতত্র সিয়াম সম্পর্কে উপরোক্ত ধারণা দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন ঃ

“তোমাদের জন্য এটা একটা স্থায়ী বিধান, সপ্তম মাসের দশম দিনে তোমরা নিজেদের আত্মাকে কষ্ট দেবে। সেদিন কেউ তোমরা কোন কাজ করবে না। কেননা সেদিন তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য প্রায়শ্চিত্ত দেয়া হবে এবং প্রভুর দৃষ্টিতে তোমরা সকল পাপ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

‘প্রভু মূসাকে বললেন, সপ্তম মাসের দশম দিন হচ্ছে কাফ্‌ফারার দিন। এদিন তোমরা ধর্মীয় সমাবেশে মিলিত হবে ও আত্মাকে নিগ্রহ করবে এবং সেদিন তোমরা কোন কাজ করবে না। কেননা সেটা কাফফারার দিন।”

পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে সিয়াম আত্মাকে কষ্ট দেয়া কিংবা নিগ্রহ করার বিষয় নয়। নয় আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নাযিলকৃত শাস্তি-বিধান। আল্-কুরআন ও আল্-হাদীসের কোথাও আপনি এমন একটি শব্দ খুঁজে পাবেন না যা সে ধরনের কোন ইঙ্গিত বহন করে। মানুষের কাছে সিয়ামকে পেশ করা হয়েছে এক মহিমান্বিত ইবাদতরূপে যার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন। সিয়ামের বিধি-বিধান ও আহকামও নীরস কিংবা অত্যাচারমূলক নয়। ফিকহ্ ভাণ্ডারে এমন একটি হুকুম আপনি খুঁজে পাবেন না, যাতে মনে হতে পারে, সিয়ামের উদ্দেশই বুঝি মানুষকে কষ্টে নিক্ষেপ করা কিংবা শক্তি ও সাধ্যের অতিরিক্ত কোন কাজে তাকে বাধ্য করা; বরং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম রোযাদারের জন্য সাহরীকে সুন্নত, বিলম্বে সাহরী করাকে মুস্তাহাব ঘোষণা করেছেন। অদ্রূপ ইফতারের সময় অযথা বিলম্ব না করে প্রথম ওয়াক্তেই খাদ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে দিনে ও রাতে প্রয়োজনে বিশ্রাম গ্রহণের অনুমতি দিয়েছেন। ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা যে কোন কল্যাণমূলক বৈধ কাজে নিয়োজিত হতেও কোন বাধা নেই, অথচ ইয়াহূদী ধর্ম মতে রোযার দিনে সমস্ত কাজ থেকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে হবে। এ নির্দেশ যে মানব স্বভাব ও ইনসানী ফিতরতের সাথে কি পরিমাণ সংঘর্ষশীল তা বোধ করি উল্লেখের প্রয়োজন নেই।

অদ্রূপ কোন কোন প্রাচীন ধর্ম মতে (এর নমুনা এখনও বাকী আছে) রোযা বা উপবাস ব্রত এক বিশেষ শ্রেণীতেই সীমাবদ্ধ। উপবাসের দায়-দায়িত্ব সাধারণত ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীদের ওপর। পারসিকদের মতে রোযা ধর্ম-প্রধান ও পুরোহিতদের জন্যই কেবল অবশ্য পালনীয়। গ্রীকদের মতে রোযা হচ্ছে নারীদের বিষয়, কর্মব্যস্ত পুরুষদের নয়।

কিন্তু ইসলাম সিয়ামকে সকল শ্রেণী-বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করে এক সার্বজনীন রূপ দান করেছে। ইসলাম বলে, প্রত্যেক সক্ষম মুসলমানকেই রমযানে সিয়াম পালন করতে হবে।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ -

"তোমাদের যে কেউ রমযান মাস পাবে তাকে আবশ্যিকভাবেই সিয়াম পালন করতে হবে।"

সকল শ্রেণী বিভক্তি ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রাচীন ধর্মসমূহে বিশেষ কারণবশত কাউকে রোযা থেকে অব্যাহতি দানের কথা নেই। কিন্তু ইসলাম এক্ষেত্রেও যথেষ্ট মানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। মাযূর (অক্ষম) ব্যক্তিদেরকে সিয়াম থেকে পূর্ণ অব্যাহতি কিংবা আংশিক সুবিধা প্রদান করেছে। আল্-কুরআন ইরশাদ করেছে ঃ

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۔

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ কিংবা মুসাফির হয় তাহলে অন্য সময় দিন গণনা করে সিয়াম পালন করতে হবে।" [সূরা আল্-বাকারা ঃ ১৮৫]

وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ۔

"যারা সিয়াম পালনে সক্ষম নয় তারা (প্রতিটি সিয়ামের পরিবর্তে) একজন মিসকীন-কে আহার দান করবে।" [সূরা আল্-বাকারা ঃ ১৮৪]

সিয়ামের ক্ষেত্রে কোন কোন ধর্মে এত দূর বাড়াবাড়ি দেখা যায়, একটানা দীর্ঘ চল্লিশ দিন পর্যন্ত খাদ্য স্পর্শ করা নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছিল। আবার কোন কোন ধর্মের শিথিলতার এমন অবস্থা যে, গোশত জাতীয় খাদ্য বর্জনকেই রোযার জন্য যথেষ্ট বলে ধরে নেয়া হয়েছিল। এছাড়া অন্য যে কোন প্রকার খাদ্য কিংবা পানীয় গ্রহণের ব্যাপারে কোন বাধা-নিষেধ ছিল না। কিন্তু ইসলাম মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি ও প্রয়োজনাতিরিক্ত উদারতা উভয়েরই বিরোধী। ইসলামী সিয়াম হলো ভারসাম্যপূর্ণ এক ঐশী বিধান। এখানে যেমন অধিকার নেই আত্মাকে অমানবিক কষ্ট দেয়ার কিংবা নিজের জন্য জীবন্ত সমাধি রচনা করার, তেমনি অবকাশ নেই স্বেচ্ছাচারিতার, বোকার মত কল্পনার স্বর্গে বাস করার।

ইয়াহূদীরা ইফতারের সময় শুধু খাদ্য গ্রহণ করত। এরপর খাদ্য পানীয় স্পর্শ করার কোন অনুমতি ছিল না। ফলে সারা রাত পানাহারসহ যাবতীয় বৈধ কাজ থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হতো। কিন্তু আল্-কুরআন মানুষের মনগড়া সকল নিয়ম-কানুন ও বিধি-নিষেধ খতম করে দিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছে ঃ

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۔

"পানাহার চালিয়ে যাও যতক্ষণ না ভোরের শ্বেত রশ্মি রেখা আঁধারের কৃষ্ণরেখা ভেদ করে।" [আল-বাকারা ঃ ১৮৭]

তদ্রূপ ইসলামের দৃষ্টিতে কেউ যদি সিয়ামের কথা ভুলে গিয়ে পেট ভরেও কিছু খেয়ে নেয় তাহলে তার সিয়াম পালন হয়ে যাবে।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রিওয়ায়েত করেছেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ কেউ যদি ভুলে কিছু পানাহার করে নেয় তাহলে সে যেন তার সিয়াম ভঙ্গ না করে। কেননা এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে দাওয়াত। [তিরমিযী]

সকল প্রাচীন ধর্মেই সৌর মাস হিসেবে রোযা রাখার বিধান ছিল। তাই দিন-তারিখ ও মাসের হিসেব রাখার জন্য সৌর বিষয়ে গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন ছিল। এ ছাড়াও সৌর বর্ষের কারণে প্রতি বছর একই সময়ে নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখতে হতো। এতে কখনও কোনরূপ পরিবর্তন হতো না। ফলে পরিবর্তনপিয়াসী মানুষ এক ধরনের একঘেঁয়েমি অনুভব করত। কিন্তু ইসলামী সিয়াম হচ্ছে চান্দ্র মাসের চাঁদ হিসেবে এবং সিয়ামের সম্পর্ক চাঁদ উদয়ের সাথে নয়, বরং চাঁদ দেখার সাথে। আল্ কুরআনে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ - قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ -

"তারা আপনাকে চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, চাঁদ মানুষের জন্য হজ্জের সময় নির্দেশক।" [আল্-বাকারা ঃ ১৮৯]

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهٖ وَاَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهٖ -

"চাঁদ দেখে সিয়াম শুরু কর এবং চাঁদ দেখে তা শেষ কর। যদি মেঘ থাকে এবং চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হয় তবে ত্রিশ দিন পূর্ণ করে নাও।" [তিরমিযী]

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, "যতক্ষণ পর্যন্ত চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ সিয়াম রাখা শুরু করবে না এবং যতক্ষণ চাঁদ না দেখবে ততক্ষণ সিয়ামের মাস

শেষ হয়েছে বলে মনে করবে না। আর যদি উদয়স্থল স্বচ্ছ না হয় তাহলে অনুমান করে নাও।"[1] [মুসলিম, তিরমিযী ও আবূ দাউদ]

এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সুফল হলো, এর ফলে পৃথিবীর যে কোন স্থানের যে কোন মুসলমান অতি সহজেই সিয়াম পালন করতে সক্ষম হবে, এমন কি গভীর অরণ্যে, পর্বত চূড়ায় কিংবা জনহীন কোন দ্বীপেও যদি সে আটকা পড়ে যায় তবু চাঁদ দেখে অনায়াসেই সিয়ামের বিধান পালন করে যেতে পারে। এজন্য তাকে সৌর বিজ্ঞানের ছাত্র হতে হবে না।

আরেকটি সুফল হলো, চান্দ্র মাসের কারণে ধীরে ধীরে রমাযানের মৌসুম পরিবর্তন হতে থাকে। কখনও রমাযান আসে গরমে, কখনও বা শীতে। মৌসুম ও আবহাওয়ার এই পরিবর্তনের ফলে একটা নতুনত্বের স্বাদ অনুভব করা যায়। শীত-গরমের সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ উভয় প্রকার সিয়ামেই অভ্যস্ত হয়ে সর্বাবস্থায় ধৈর্য ধারণ ও শোকর আদায়ের তাওফীক লাভ করে।

একজন মুসলমান যখন হিকমত, প্রজ্ঞা ও কল্যাণে ভরপুর ইসলামী সিয়ামের সাথে প্রাচীন ধর্মসমূহের উপবাস ব্রতের তুলনা করে এবং সিয়ামের প্রতি মুসলিম উম্মাহ্‌র একনিষ্ঠ প্রেম ও গভীর সম্পর্কের ইতিহাস পাঠ করে এবং সেই সাথে রোযার প্রতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচরণ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে তখন তার অন্তরের অন্তস্থল থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসে এ অকপট স্বীকৃতি ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا - وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْلَا اَنْ هَدَانَا اللّٰهُ - لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ -

"সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ আমাদের পথ না দেখালে কিছুতেই আমরা পথ পেতাম না। অবশ্যই আমাদের প্রতিপালকের বার্তাবাহকগণ সত্য নিয়ে এসেছিলেন।"

[সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৪৩]

---

১. ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে চাঁদের উদয় আসল নয়, চাঁদ দেখতে পাওয়াই আসল। অতএব চন্দ্রোদয় প্রমাণ করার কোন উপায় অবলম্বনের কোন আদৌ প্রয়োজন নেই। কিন্তু কিছু কিছু দেশে এই অনভিপ্রেত প্রবণতা দেখা দিয়েছে। 'চাঁদ দেখে রোযা রেখ' এই হাদীস দ্বারাই আসলে সব জটিলতা পরিষ্কার হয়ে যায়।

সিয়াম